জুন ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

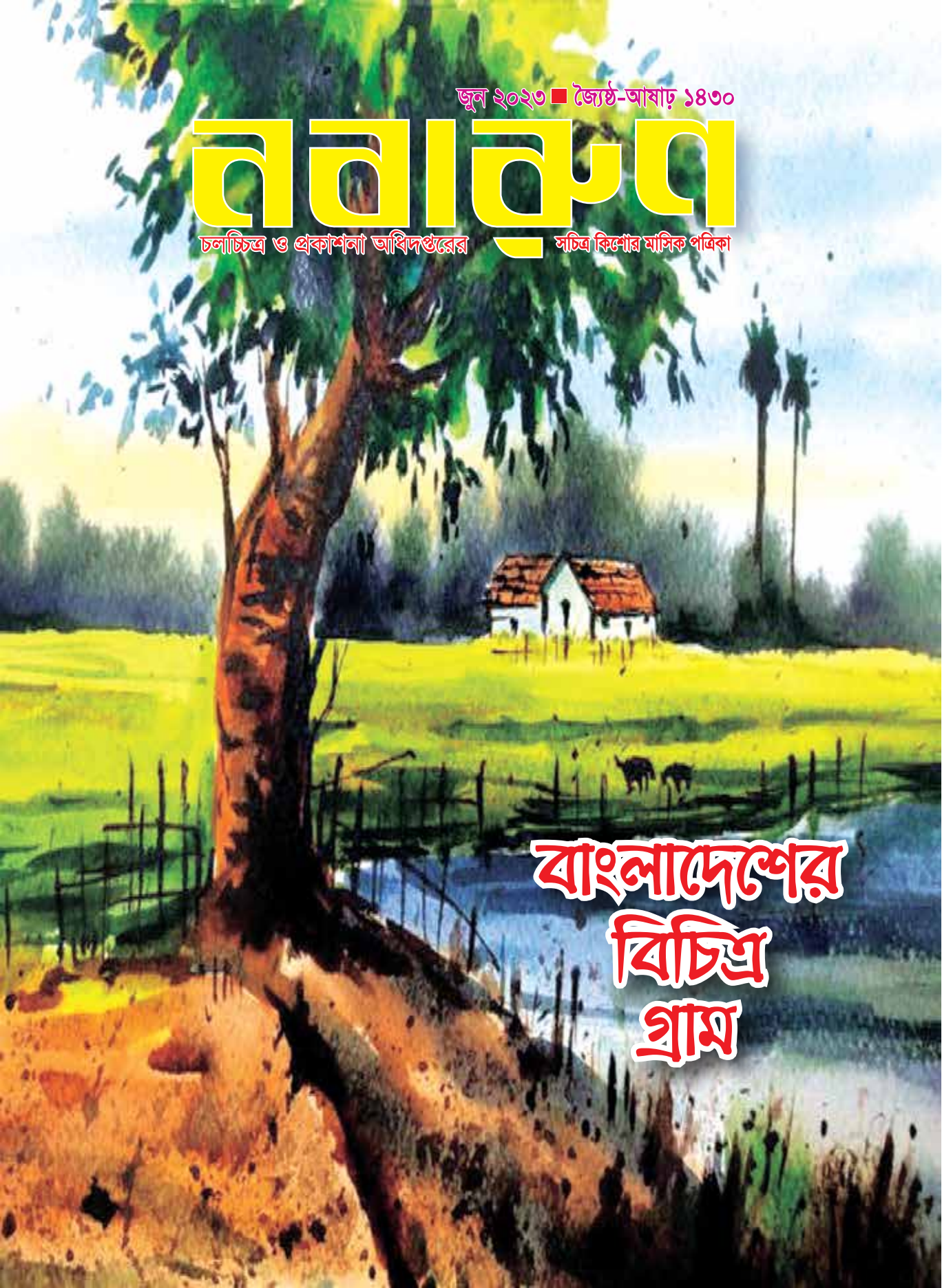

বাংলাদেশের বিচিত্র গ্রাম

সাবিহা তাসবিহ, অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা

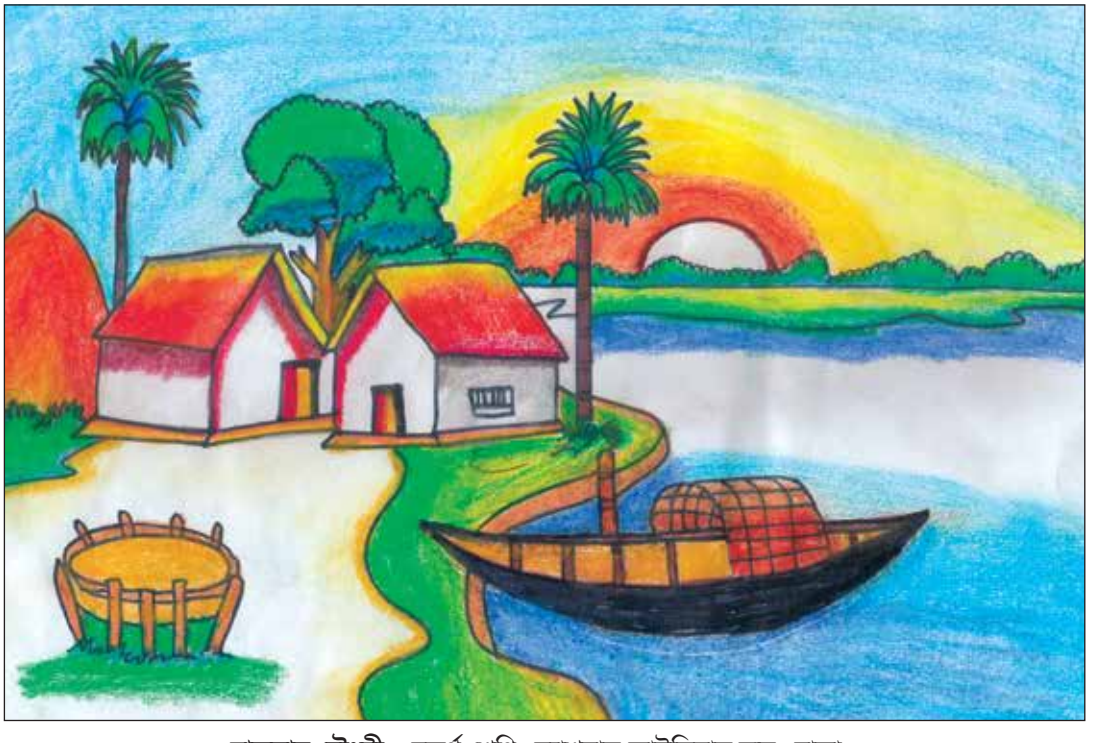

রাফসান চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, বাংলাদেশ একটি গ্রাম নির্ভর দেশ। আমাদের আছে প্রায় সত্তর হাজার গ্রাম। এ গ্রামেই আমাদের বিখ্যাত মানুষগুলো জন্ম নিয়েছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লিকবি জসীমউদ্দীন, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী প্রমুখ গুণীজনের গ্রামেই জন্ম ও বেড়ে উঠা।

আমরা যারা শহরে থাকি, একটু ছুটি পেলেই গ্রামে বেড়াতে যাই, অনেক আনন্দ করি। গ্রামই আমাদের আসল ভালোবাসা। একেকটা গ্রাম যেন একেক রকম সুন্দর। এখানে আছে মায়ের বুক ভরা ভালোবাসা, বাবার স্নেহের শাসন, প্রিয়জনের অকৃত্রিম ভালোবাসা। যেমনটি কবি জসীমউদ্দিন বলেছেন, 'তুমি যাবে ভাই– যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়/গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়...।' বন্ধুরা, এবারের সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি বাংলাদেশের বিচিত্র সব গ্রাম নিয়ে। যেমন– বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো গ্রাম, সবচেয়ে উঁচু গ্রাম, রূপপুর এখন রূশপুর, সবচেয়ে ছোটো গ্রাম, জনমানবশূন্য গ্রাম, আলপনা গ্রাম, বাংলাদেশের গ্রামে রানি এলিজাবেথ, সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম, ঐতিহাসিক গ্রামসহ আরো অনেক গ্রাম। এছাড়া গ্রাম নিয়ে নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া, আঁকা ছবিও রয়েছে। পড়ে জানিও কিন্তু!

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও প্রতি বছর এই দিনটি নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এবারের স্লোগান- 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'।

ছোট্ট সোনামণিরা, জুন মাসের তৃতীয় রবিবার সারা বিশ্বে পালিত হয় বাবা দিবস। বাবা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ও প্রাণের একটি শব্দ। বাবাকে আমরা সবাই ভালোবাসি। বাবা দিবসে সকল বাবাদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

জ্যৈষ্ঠের গরমে তোমরা সবাই সাবধানে থাকবে, পুষ্টিকর সব রসালো ফল খাবে, ভালো থাকবে। নবারুণের সঙ্গে থাকবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

সেকালের গ্রাম একালের গ্রাম/তারিক মনজুর ০৪
বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি/ইশরাত জাহান ১৭
মেঘের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু গ্রাম/ডালিয়া ইয়াসমিন ২০
বাংলাদেশের গ্রামে রানি এলিজাবেথ/নুসরাত জাহান ২৪
সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম/মেজবাউল হক ২৬
জনমানব শূন্য গ্রাম/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ২৮
বিলুপ্ত শত বছরের গ্রাম/মো. আনিসুজ্জামান ২৯
হাওর বেষ্টিত অষ্টগ্রাম/মো. জামাল উদ্দিন ২৯
বিশ্বের প্রথম ইউটিউব গ্রাম/জিনাত রহমান ৩১
চায়না গ্রাম/তাসনিম তুবা ৩১
বাংলাদেশের কাশ্মীর তাহিরপুর/সাদিয়া ইফফাত আঁখি ৩২
সবচেয়ে বড়ো গ্রাম/শাহানা আফরোজ ৩৩
আদর্শ গ্রাম/ফারহানা চৌধুরী ৩৪
এক গ্রামে ৩৬৫টি পুকুর/ মো. আদনান শাহরিয়ার ৩৪
মাটির বাড়ি বেষ্টিত গ্রাম/মাহমুদ হাসান ৩৫
নারী ফুটবলারদের গ্রাম/ফাতেমা জেসমিন রিমা ৩৬
গোলাপ গ্রাম/বশিরুল আলম ৩৬
গহনা ও শাক পাতার গ্রাম/নামিরা রহমান অর্থি ৩৭
চারদিকের গ্রাম/সানাউল হক ৩৮
রূপে ভরা জলের গ্রাম/সারাহ জেরিন ৩৯
দেশের প্রথম ডিজিটাল গ্রাম/আবু আহাদ ৪০
নার্সারি গ্রাম/নুসরাত কিন্তি ৪১
পরিবেশ সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু/মঈনুল হক চৌধুরী ৪৬
বাংলা কবিতায় গ্রাম/কাজী মহম্মদ আশরাফ ৫০
হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ অনুষঙ্গ/সুমন প্রামানিক ৫৭
কৈখালী গ্রামের কিশোরীরা/জান্নাতে রোজী ৬০
বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ ৬১

কবিতা ও ছড়া

৪২ বশিরুজ্জামান বশির
৪৫ কামাল হোসাইন
৪৯ ইউনুস আহমেদ/রকিবুল ইসলাম
৫৫ সাবিত্রী রানী/মনির জামান
আলমগীর কবির/মো. মোনায়েম আহমেদ
৫৬ আরিফুল ইসলাম মুকুল

ছোটোদের ছড়া

১৯ নূরুন নাহার সামিরা
৪২ রওশন-ই আলম/মো. তাসিন হোসেন
৫৬ মো: জাওয়াদ আলম

গল্প

০৮ সময়পুর/ধ্রুব নীল
১২ গ্রামের নওজোয়ান/নাজমুল হুদা
১৫ নৌকা ও মাঝি/মুহাম্মদ ইসমাঈল
৪৩ গোয়েন্দা কাঠিখান ও হারানো গরু/বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

ছোটোদের আঁকা

শেষ প্রচ্ছদ: মুজতানিবা মোজাহিদ
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: সাবিহা তাসবিহ/রাফসান চৌধুরী
তৃতীয় প্রচ্ছদ: মুহসিনা রহমান/ত্বকী আহমেদ রিহিন
৬৩ ইরাম ইনায়া/আহনাফ শাহরিয়ার নাহিন
৬৪ রেদোয়ান মোস্তফা/নাজিবা নাওয়াল

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিয়া

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ ভরা ধান তার জল ভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পুব দিকে উঠে,
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফুটে।

সেকালের গ্রাম একালের গ্রাম

তারিক মনজুর

একসময় গ্রামে হাতেখড়ি হতো কলাপাতায়। 'হাতেখড়ি' মানে পড়াশোনার শুরু। কলাপাতাকে খাতা বানানো হতো। সরু একটা কাঠিকে বানানো হতো কলম। তারপর সেই কাঠি দিয়ে কলাপাতায় শিশুদের বর্ণ লেখানো হতো। হাতেখড়ির পর তাদের হাতে উঠত চক আর স্লেট। লেখার কাজে চকের ব্যবহার এখনও দেখা যায়। তবে কালো রঙের স্লেট এখন আর দেখা যায় না। আজকের দিনে গ্রামের আর শহরের ছেলেমেয়েরা পেনসিল-খাতা নিয়ে স্কুলে যায়। প্রথম প্রথম পেনসিল দিয়ে লেখে বটে, কিন্তু একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে হাতে কলম তুলে নেয়।

এখনকার সময় কলম বলতে বোঝায় বলপেন আর জেলপেন। কিন্তু একসময় কলম বলতে ছিল ফাউন্টেন পেন বা ঝরনা কলম। দোয়াতে তৈরি করা কালিও বিক্রি হতো ফাউন্টেন পেনের সাথে। তার আগে অবশ্য কালো রঙের বড়ি কিনতে পাওয়া যেত। পানিতে সেই বড়ি গুলে কালি বানানো হতো। আর ফাউন্টেন পেন আসার আগে গ্রামের ছেলেরা ব্যবহার করত বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো কলম। শহরে তখন কলম আর নিব কিনতে পাওয়া যেত। কলমের মাথায় নিব লাগিয়ে নিলে খুব সুন্দর লেখা হতো।

লেখাপড়া শেখার জন্য আগে গ্রামের মানুষের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল না। দুচার গ্রামে হয়ত একটা বিদ্যালয় ছিল। ছেলেরা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে সেই বিদ্যালয়ে যেত পড়াশোনা করতে। স্কুলের জন্য কোনো নির্ধারিত পোশাকও ছিল না। তাই যে যার মতো জামা পরে ক্লাস করত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের দেখা পাওয়া যেত না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বড়োজোর ক্লাস থ্রি-ফোর পর্যন্ত মেয়েরা পড়ত।

আগে ম্যাট্রিক বা এসএসসি পাস করা ছেলেও খুব কম দেখা যেত। কেউ ম্যাট্রিক পাস করেছে শুনলে গ্রামের মানুষ তাকে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত। পাস করা ছেলেকে দুধ দিয়ে গোসল করানোর ঘটনাও শোনা যায়। গ্রামের খুব কম মানুষই বই পড়তে পারতেন। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যায় বসত পুঁথি পড়ার আসর। একজন পুঁথি পড়তেন, অন্যরা তাঁকে ঘিরে বসে শুনত সেই পুঁথির কাহিনি।

মেয়েদেরকে বেশি পড়াশোনা করানো হতো না। একটু বাংলা আর আরবি পড়তে পারলেই চলত। তাদেরকে মূলত ঘরসংসারের কাজের উপযোগী করে তোলা হতো। রান্নাবান্নার কাজ, সেলাই আর নকশার কাজ এসব মেয়েদের শিখতে হতো। খুব প্রয়োজন না হলে বড়ো মেয়েরা বাড়ির বাইরে যেতেন না। বিয়ের পরে বউ আনা হতো পালকিতে করে। চারজন বা ছয়জন বেহারা সেই পালকি কাঁধে নিয়ে দ্রুত তালে হেঁটে চলত। সময়ের বদল ঘটেছে। তাই এখন পালকির বদলে বউ আনা হয় মোটরগাড়িতে করে। তাছাড়া সমাজে ছেলেদের আর মেয়েদের কাজের পার্থক্যও কমেছে।

গ্রামের অনেক পেশা একালে দেখা যায় না। আগে মাটি দিয়ে কুমোর হাঁড়ি-পাতিল বানাতো। কামার লোহা দিয়ে দা-বটি বানাতো। তাঁতি তাঁতে কাপড় বুনত। এসব পেশার মানুষ এখন কম দেখা যায়। কারণ, আজকাল গ্রামের মানুষ মাটির থালা-বাসনের বদলে মেলামাইনের থালা-বাসন ব্যবহার করে। লোহার শাবল-কুড়াল ইত্যাদি জিনিসের চাহিদা আগের মতো নেই। আর মিল বা ফ্যাক্টরি থেকেই ভালো মানের কাপড় পাওয়া যায়।

পোশাকেরও বদল ঘটেছে এ যুগে। আগে গ্রামের মানুষের পোশাক বলতে ছিল লুঙ্গি আর শাড়ি। পায়ে খুব কম মানুষই জুতা-স্যান্ডেল পরত। দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে পুরুষেরা ফতুয়া বা পাঞ্জাবি গায়ে দিত। উঁচু ঘরের পুরুষ-নারীরা পায়ে জুতা পরতেন। ছোটো ছেলেমেয়েদের জামা ঘরে হাতে সেলাই করে বানানো হতো। কখনো কখনো শহর থেকে তাদের জন্য জামা-প্যান্ট কিনে আনা হতো। সেকালে গ্রামের মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে করে। বাংলাদেশ নদীপ্রধান হওয়ায় নৌকায় করেও অনেক জায়গায় যাওয়া যেত। মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল, রেলগাড়ি, স্টিমার– এগুলো কখনো চোখের সামনে দেখলে গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত।

> গ্রামের মানুষ সেকালে বাংলা সন তারিখ মেনে চাষবাস আর অন্যান্য কাজ করত। জন্ম-মৃত্যুর হিসাবও রাখত বাংলা সাল ধরে।

গ্রামে আগে পাকা রাস্তা বা ইট-খোয়ার রাস্তা বলে কিছু ছিল না। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তা কাদায় পিচ্ছিল হয়ে যেত। বেশিরভাগই ছিল মাটির ঘর। সেই ঘর আবার ছাওয়া হতো ছন বা খড় দিয়ে। এর কিছু পরে টালি আর টিন দিয়ে ঘরের চাল বানানো শুরু হয়। বৃষ্টির দিনে মাটির ঘরগুলোর অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। অনেক সময় দেয়াল ধসে যেত। প্রায়ই খড়ের চাল ভেদ করে ঘরের ভেতর পানি পড়ত টপটপ করে। এখন গ্রামে ইটের তৈরি দালান দেখা যায় বেশি। বোঝা যায়, মানুষের টাকা হয়েছে একালে। কিন্তু সেকালে গ্রামের মানুষ দরিদ্র জীবন কাটাতো।

এখন গ্রামের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এসেছে। টেলিভিশন,

মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ হরেক রকম প্রযুক্তি আছে তাদের হাতে। আর সেকালে ছিল কেবল রেডিও। তাও ধনী ঘরগুলোতে। সেই রেডিও চলত একবার ব্যবহারযোগ্য ব্যাটারিতে। ব্যাটারিতে চলত টর্চলাইটও। অন্ধকার রাতে পথ চলার জন্য হাতে থাকত টর্চ। সন্ধ্যার পরপরই ঘরে কুপি বা ল্যাম্প জ্বালানো হতো। এসব কুপি জ্বলত কেরোসিনে। কেরোসিনে জ্বলত কাচের লণ্ঠন আর হারিকেনও। গ্রামের কোনো কোনো দোকানে হ্যাজাক লাইট জ্বলতে দেখা যেত। মানুষ রাতে কাজ করত না। সন্ধ্যার পর এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুম ভাংত খুব ভোরে, মোরগের ডাকে।

ঘুম থেকে উঠে প্রথমে উঠান ঝাড়ু দেওয়া আর ঘর লেপার কাজ করতেন নারীরা। আর পুরুষেরা লাঙল কাঁধে গরু নিয়ে মাঠে ছুটতেন। এখনকার মতো ট্রাক্টর বা আধুনিক কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। ফসল কাটা, ধান মাড়াই আর অন্যান্য কাজ মানুষ দলবেধে নিজ হাতেই করত। চাষাবাদে কোনো বিদেশি জাত কিংবা উচ্চফলনশীল জাতের ব্যবহার ছিল না। গোবর সার কিংবা হাতে তৈরি জৈব সার ছিল জমি উর্বর করার প্রধান উপায়। সে-কালে পুকুর, হাওড় বা নদী থেকে মাছ ধরা হতো। আজকের মতো মানুষ মাছ চাষ করত না। গ্রামের নারীরা হাঁস, মুরগি আর ছাগল পালতেন। তখন গ্রামগুলোতে প্রচুর গাছপালা আর জঙ্গল ছিল। সেসব জঙ্গল থেকে বাঘডাশা এসে প্রায়ই হাঁস, মুরগি ধরে নিয়ে যেত।

সেকালে গ্রামে নানা জাতের গাছপালা আর পশুপাখি দেখা যেত। বাড়ির আশেপাশে এমনিতেই জন্মাতো ঢেঁকিশাক, কচু, কলমিলতা। এগুলো মানুষ খাওয়ার কাজে ব্যবহার করত। দিনে হরেক রকম পাখির ডাক

শোনা যেত। রাতে ঝোপঝাড়ে জোনাকি পোকা জ্বলত-নিভত। হুতোমপ্যাঁচা 'ভূত ভূতুম' করে ডেকে উঠত রাতে। আর শিয়াল দলবেঁধে 'হুক্কাহুয়া' করে ডেকে উঠত দিনরাতের আট প্রহরেই। সেকালে গ্রামের মানুষের মধ্যে অনেক রকম কুসংস্কার বা বিশ্বাস ছিল। মানুষের ধারণা ছিল কাক বা হুতোমপ্যাঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়। আবার ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ে হোঁচট খেলে কিংবা কেউ হাঁচি দিলেও অমঙ্গল হয়। গ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থাও আজকের মতো ভালো ছিল না। মানুষ অসুস্থ হলে কবিরাজি আর ঝাড়ফুঁকের ওপর নির্ভর করত।

গ্রামে আগে দোকানপাট কম ছিল। সাধারণ তেল-লবণ কেনার জন্য মানুষ হাটবারের অপেক্ষা করত। সপ্তাহে সাধারণত দু-দিন হাট বসত। হাটে প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিস পাওয়া যেত। হাটের দিনে ভালো কাপড় পরে বাজারের ব্যাগ নিয়ে পুরুষেরা বের হতেন। তারা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেন, আবার এ-ওর সাথে গল্পগুজবও করতেন। সেকালে গ্রামগুলো ছোটো ছোটো পাড়ায় বিভক্ত ছিল। মানুষ যাওয়া-আসা করত এ-বাড়ি ও-বাড়ির ওপর দিয়ে। ফলে, সবাই সবার খবর জানত। তাছাড়া কোনো গ্রামে বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটলে আশপাশের সব গ্রামে সেই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ত।

গ্রামের মানুষ সেকালে বাংলা সন তারিখ মেনে চাষবাস আর অন্যান্য কাজ করত। জন্ম-মৃত্যুর হিসাবও রাখত বাংলা সাল ধরে। কারো বয়স সুনির্দিষ্টভাবে কেউ লিখে রাখত না বা মনে রাখত না। একজনের সঙ্গে আরেক জনের তুলনা করে বয়সের একটা মোটামুটি হিসাব করা হতো। আর ওজন করা হতো সের-ছটাক-তোলার হিসাবে। জমির হিসাব করা হতো বিঘা-পাখি-কাঠা ধরে।

সময়ের সাথে সাথে সেকালের গ্রামের অনেক কিছুর বদল ঘটেছে। একালের গ্রামের অনেক কিছুরও বদল ঘটবে ভবিষ্যতে। গ্রামগুলো ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হচ্ছে। আর শহরগুলো বদলে উচ্চমানের সুবিধাযুক্ত নগরীতে পরিণত হচ্ছে। ■

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

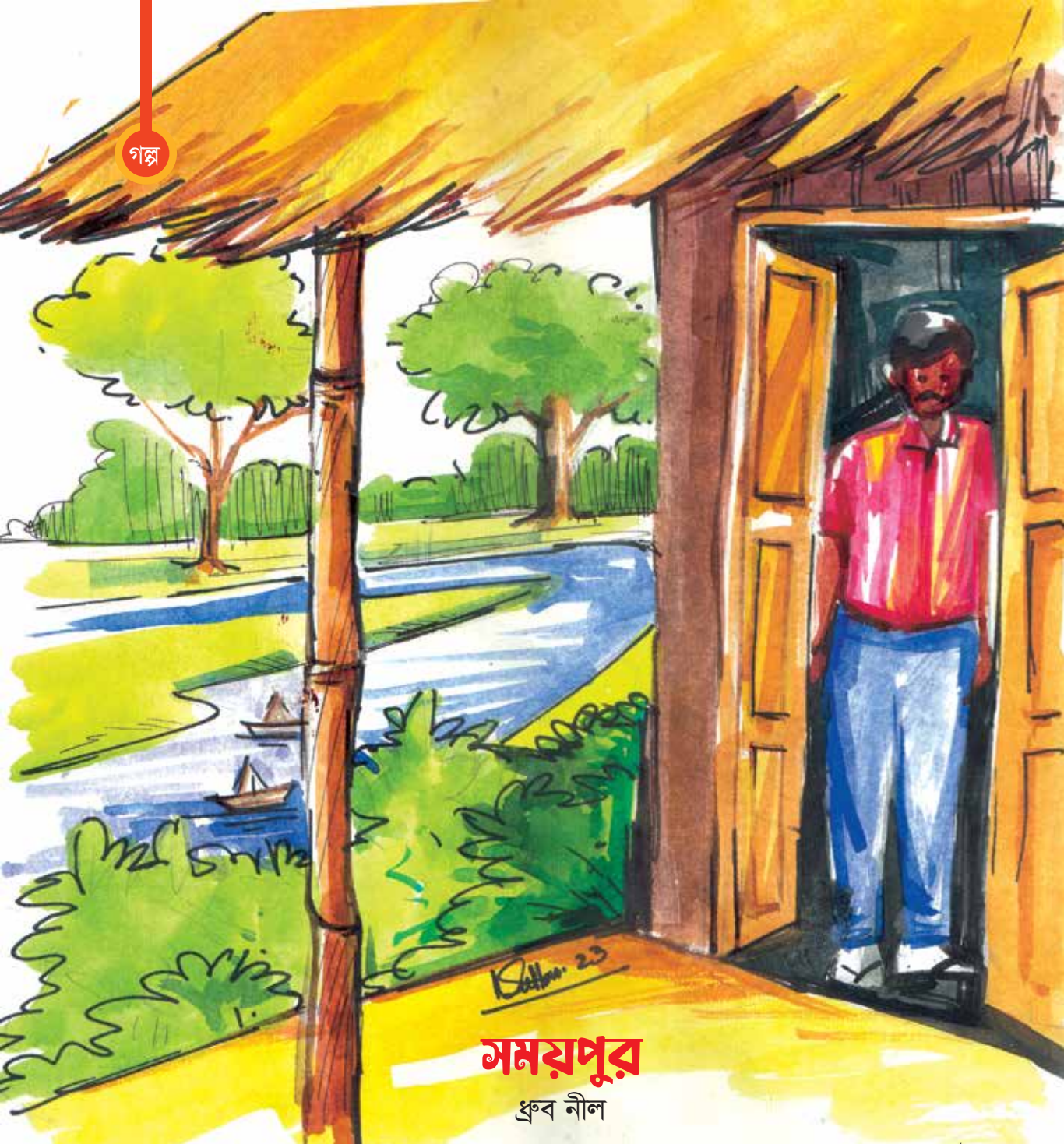

সময়পুর

ধ্রুব নীল

এ নামে বাংলাদেশে কোনো গ্রাম নেই। মানে এখন আমাদের যে মানচিত্র তাতে এর অস্তিত্ব নেই। গ্রামের নামটা আমারই দেওয়া। কারণ, আমার মতে নামটা সময়পুরই হওয়া উচিত। যদিও ওই গ্রামের লোকজন নাম-ধাম নিয়ে ভাবে না। তাদের কাছে গ্রাম মানে গ্রাম।

সময়পুর গ্রামে সময় যেতে চায় না। সবার হাতেই অফুরন্ত সময়। কাজ করতে করতে কোনো কৃষকের মনে হলো আজ নিড়ানি বাদ দিয়ে বসে থেকে শরতের ঘ্রাণওয়ালা বাতাস খাবে। তো সে সেটাই করে যাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এক সময় রাত হবে। শেয়াল ডাকবে। শেয়ালের ডাক শুনে শুনে কোনো

শিশুকে তার মা গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াবে। সেটাও অনেক সময় নিয়ে। তারপর নিশাচর পাখির গাছের গর্তে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসবে গভীর রাত। যে রাতটাও কাটতে চাইবে না অনেকক্ষণ।

এখানে আসার পরই আমি গ্রাম কাকে বলে শিখেছি। গ্রাম হওয়ার মতো সবই আছে সময়পুরে। চিকন লতার মতো সজনে, খালের পাড়ে বেড়ে ওঠা কলমি গাছ, তাতে কলমি ফুল, বেতফলের ঝোপ, ভাটফুলের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ, ঝিরি নালা দিয়ে বয়ে চলা কাগজের নৌকা, শতবর্ষী একটা বটগাছ ও সেটাকে ঘিরে বসা গানের আসর।

তবে এসবের মাঝে আমার পছন্দ হলো একটা নৌযান। ন্যানোব্লাস্ট ইঞ্জিন ছাড়াই নৌকা নামের যে যানে বসলে আমার আর নিজের সময়ের বিধ্বস্ত পৃথিবীটায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। ও হ্যাঁ, নৌকায় বসলেও কিন্তু সময়টা আটকে যায়!

সময়পুরে শীতকালটা কাটিয়েছি কদিন আগে। ভাপা পিঠা আর দুধপুলির স্বাদ এখনও আমার নিউরাল নেটওয়ার্কে গেথে আছে। সঙ্গে করে নিজের সময়ের কোনো প্রযুক্তি আমি আনিনি। তাই আপাতত মনে রাখার চেষ্টা করছি সব।

হারু মাঝি নৌকা ছাড়তেই আমি স্মৃতিতে হারিয়ে গেলাম। তার মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা সুর বের হচ্ছে। এমন গানও এখানে আসার আগে শুনিনি। ভাওয়াইয়া নামের ওই গানের ফাঁকে এবার নিজের ফেলে আসা বর্তমানটার কথা বলা যায়।

আমি যে বাংলাদেশ থেকে এসেছি, সেখানে চলছে তিন হাজার চুয়ান্ন সাল। সময়পুরে কত সাল? এখানে কোনো ক্যালেন্ডার দেখিনি অবশ্য। আমার পৃথিবীর একমাত্র আমিই সেই বিজ্ঞানী যে গ্রামটা খুঁজে পেয়েছি। সেটা বছরখানেক আগের কথা।

সময়পুরের নামটা প্রথমে আমার কাছে ছিল পঁয়ত্রিশ ডিজিটের একটা সংখ্যা। আমার সময়ের বাংলাদেশে যা কিনা এক দুর্গম ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ওই ধ্বংসস্তূপের মাঝে ছোটো কালো দরজাটার অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল আমার কোয়ান্টাম বাবল স্পেকট্রোমিটারে। সাদাসিধে একটা স্পেস পোর্টাল ভেবেই ঢুকে পড়ি ওই দরজার ভেতর। এরপর নিজেকে আবিষ্কার করি ঝুম বৃষ্টিতে একটা সুবিশাল গাছের তলায়। পেছনে তাকিয়ে দেখি পোর্টাল গায়েব। আর সামনে সবুজ রঙের সারি সারি গাছ।

সেদিন থেকেই আমি এ গ্রামের বাসিন্দা। প্রথম দিকে এখানে সেখানে কয়েকদিন কেটেছে। পরে গ্রামের লোকজন আমাকে আশ্রয় দেয়। মানুষগুলোর অমায়িক ও আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করে। আটকে রাখে সময়পুরে।

সবচেয়ে অদ্ভুত লেগেছিল যে, তাদের খাবার তৈরিতে কোনো প্রিন্টার ব্যবহার করতে হয় না। মাটি থেকে গাছ বেড়ে উঠলেই তবে ওরা খায়। আর সেটা বেশ মজা করেই। আমিও সেটাই খাচ্ছি নিয়মিত। এ খাবারের স্বাদ আমার তিন হাজার চুয়ান্ন সালের বাংলাদেশের কোনো খাবারে পাইনি।

আমি যে সময় থেকে এসেছি সেখানে গ্রাম নেই। গ্রাম কী জিনিস কেউ জানেই না। আছে শুধু সেক্টরের পর সেক্টর। দশ-পাঁচ-তেরো নম্বর সেক্টরে আমার ঘর। সেখানে আমার স্ত্রী মারিনি ও একমাত্র মেয়ে ইরিনা আমার অপেক্ষায় আছে। মাঝে মাঝে ওদের কাছে ফিরে যাবার তাগাদা বোধ করলেও আপাতত পোর্টালটা মানে সেই কালো দরজাটা খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য ফেরার তাগাদা এখনও প্রবলভাবে তৈরি হয়নি।

ইরিনা অনেক বড়ো হয়েছে। গ্রহ-গ্রহান্তরে গবেষণায় দিন কাটে তার। মারিনিও কাজ করে যাচ্ছে আন্ত-গ্যালাক্টিক কমিটির শান্তিরক্ষা মিশনে। তার দেখাও পাওয়া যায় কদাচিৎ।

সময়পুরে এতদিন অনেক কিছু শিখেছি ও মানুষগুলোকেও বুঝতে পেরেছি। কদিন আগে রসুল মিয়া নামের এক খাদ্য উৎপাদানকারী আমাকে তালের শাঁস নামের একটি রসালো বস্তু খাওয়ালেন। গাছ থেকে একগাদা পেড়ে বললেন যত খুশি খান। খেতে গিয়ে মনে হলো আমার জগতে এমন স্বাদের খাবার কিনতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার ইউনিট ব্যয় করতে হবে।

ওই দিন শরিফের মা খাইয়েছেন লাউ-চিংড়ি নামের একটি যৌগিক তরকারি। এখানকার বিনোদনগুলোও অদ্ভুত। ভার্চুয়াল কিছুই নেই। সবই বাস্তব। রতনের সঙ্গে বড়শি ফেলে দুটো পুঁটি মাছ ধরার পর আমার মনে হলো শরীরে কেউ প্রচণ্ড খুশির হরমোন নিও-ডোপামিন পুশ করেছে। রতনের সঙ্গে আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মাছরে মাছ! এইবার তুই নাচ!'

এখানকার শব্দ, ছন্দ ও আনন্দ প্রকাশের বিচিত্র সব ভাষা ইতোমধ্যে আমার শেখা হয়েছে। ধানগাছের গোড়া শুকিয়ে আসার পর খড়ের গাদাটাকে আমি নাম দিয়েছিলাম হেমন্তের প্রহরী। যদিও লোকজন আমার এসব প্রশংসা শুনে হাসে আর বলে, 'ভাইজান যে কোন দুনিয়াত থাকেন।' আমি তাদের বোঝাতে পারি না যে আমি কোন সময়ের দুনিয়া থেকে এসেছি।

সময়পুরেও সময় যায়। তবে কোন গতিতে, সেটা বোঝার জো নেই। তবে আমার হিসাব বলছে, এখানে অনন্তকাল পার হলেও সেটা আমার সময়ের কয়েক মুহূর্তের সমান হতে পারে।

কিশোর রতনের সঙ্গে খাতির হয়েছে বেশ। দূরন্ত ছেলেটার ফকফকা হাসির উৎস আমার জানা নেই। তবে সব কিছুতেই তার আনন্দ। তার সঙ্গে ফড়িং ধরার মিশনে নেমে আমি হয়রান হয়েছি। একটাও ধরতে পারিনি।

'এ গ্রামের বাইরে কী আছে রতন?'

'জানি না। কিছু নাই।'

'বলো কী! গ্রামটা আস্ত মহাকাশ নাকি? স্পেস একদম বেঁকে গেছে?'

'হইতে পারে। জানি না।'

'চল তো হাঁটা দেই। দেখি গ্রামের শেষ প্রান্তে কী আছে।'

'যামু না। আম্মা পিডাইবো।'

'মারবে না। আমি আছি তো।'

'চলেন তাইলে। সাঁঝের আগে ফিরতে হইব।'

হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছিলাম একটা ধোঁয়াটে দেওয়ালের সামনে এসে পড়ব।

তেমনটা হলো না। পরিচিত একটা ধানক্ষেতের আইল দেখে বুঝতে পারলাম আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে এসেছি। ঠিক যেন মিনি একটা ব্ল্যাকহোল। পুরো স্পেসটাই বেঁকে আছে এখানে। আর সম্ভবত এ কারণেই এখানে সময়টা এমন অদ্ভুত কায়দায় চলে।

'চলেন। দিয়া ভূতে ধরসে আমাদের। যতবার যাইবেন এইখানেই আবার আসতে হইব। কাশিনাথ মন্দিরে একটা পুরানো ঘর আছে। সেখানে ভূত আছে। মানুষ গেলে আর আসে না। এইটা সেই ভূতের কারবার।'

সেদিন মনেপ্রাণে ভূতের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে চলে গেলাম ডেরায়। কুপিবাতি নামের একটি বস্তুতে জ্বলছে ফসিল তেল। তার আলোয় নাচানাচি করছে কত ছায়া। আমি সেই ছায়ার নৃত্য দেখছি আর ভাবছি কত কী। এমন সময় দরজায় কার যেন ছায়া।
'চাচা মিয়া ঘুমান? আমি রতন।'
'রতন এত রাতে!'
'মাঝে মইদ্যে রাইতে বাইর হই। ভূত দেখনের লাইগা।'
'ভূত কোথায় দেখবে!'
'চলেন, কাশিনাথ মন্দিরে যাই।'

আমি আবারও এক অমোঘ আকর্ষণের ফাঁদে পড়ে গেলাম। কী মনে করে সঙ্গের ব্রিফকেসটাও নিলাম। তাতে আমার পথের দিশারি কোয়ান্টাম বাবল।

জ্বলজ্বলে শেয়ালের চোখ দেখে দুজন পা চালালাম দ্রুত। ঘোষদের পুকুর পাড় ঘেঁষে যাওয়ার সময় একটা প্যাঁচা ভীষণ রকম ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দেখল। রাজনদের পাঁচমিশালি সবজি ক্ষেত পাড়ি দেওয়ার সময় কুড়িয়ে পেলাম ঝরে পড়া পাকা গাব। ওটার সঙ্গে দুটো পেয়ারাও পেড়ে দিলো রতন। খেতে খেতে পেয়ে গেলাম কয়েকটা কাউফল। বেশ মজাই লাগে ফলটা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর রতন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই মন্দিরে। জংলায় ভরা বড়ো উঠোন। এরপর একটা মূল দরজা। ভেতরে ঢুকব? আমি কি ভয় পাচ্ছি? অসংখ্যবার ইন্টার-গ্যালাক্টিক মিশন সম্পন্ন করা বিজ্ঞানী আমি। আর এখন কিনা একটি পোড়ো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভূতের ভয় পাচ্ছি! মারিনি ও ইরিনা শুনলে নিশ্চিত আমার ব্রেইন রিবুট করতে চাইবে। নাহ। সেটা হতে দেবো না। তাতে আবার এখনকার স্মৃতিগুলো সব হারিয়ে যাবে। অন্যরকম এই ভয়ের স্মৃতিটাকে যে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে প্রতিবাদ জানালো দরজা। ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমার পেছনে রতন। সেও সিঁটিয়ে আছে বেশ। আচমকা বিপ বিপ করে উঠল আমার কোয়ান্টাম বাবল স্পেকট্রোমিটার। এখানে কোথাও অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেয়েছে! কোথায়? লণ্ঠন উঁচিয়ে দেখলাম সামনে আরেকটা ভারী দরজা। অনেক দিন খোলা হয়নি যা।
দরজা খুলতেই দেখি যা ভেবেছি তাই। এক কোণে সেই গোলগাল কালো ধোঁয়ামাখা চাদরের মতো দরজা।
'ভূতের দরজা। ঢুইকেন না স্যার।'
রতনের সতর্কবার্তা আমার কানে এলেও মাথায় ঢুকল না। বুঝে গেছি ব্যাপারটা। এই সেই হারিয়ে যাওয়া পোর্টাল। সময়পুরে আর কখনো আসা হবে আমার? দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই কানে এল অস্পষ্ট একটা রেডিওর সম্প্রচারের মতো শব্দ। ইরিনা কাকে যেন বলছে 'বাবাকে খুঁজে পেতে দরকার হলে আমি ড্রাকুনা গ্যালাক্সিতেও যাব।'

আমি জানি, ওই গ্যালাক্সিতে ভয়ানক সব অপরাধপ্রবণ প্রাণীরা থাকে। মেয়ের এমন কান্না কান্না গলা শুনে আর থাকতে পারলাম না।

রতনের দিকে ফিরে তাকালাম হাসিমুখে। তাকে বোঝালাম, সব ঠিক আছে। এ ভূত ভালো ভূত। ব্রিফকেস থেকে বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম একটা ডায়েরি। গত এক বছরে বসে বসে লিখেছি ওটা। আমার পৃথিবীর গল্প। রতন বড়ো হয়ে পড়বে আর সব বুঝবে এমনটাই আশা আমার। বড়ো না হলে ক্ষতি নেই। সব বুঝতে হবে এমনও কথা নেই।

পা বাড়ালাম কালো ধোঁয়াটার দিকে। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, সময়পুরে গোধুলির ঠিক আগে আগে পুকুরের ঘাটে বসা আসরে বকপাখির উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে লোকেরা আলাপ করবে আমার হারিয়ে যাওয়ার গল্প। রতনের কথা কেউ হয়ত বিশ্বাস করবে। আবার হয়ত রতন কাউকে বলবেই না গভীর রাতের এই রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা। ■

গল্পকার

গল্প

গ্রামের নওজোয়ান

নাজমুল হুদা

পশ্চিম পাড়ার পুরানো স্কুল ভবনটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ভাঙা হয়নি। বাইরের দেয়ালের কিছু ইট খসে পড়েছে। ভিতরে ময়লা আবর্জনার স্তূপ। ভুল করেও কেউ ভিতরে ঢোকে না। আমাদের ক্লাস হতো পাশের ভবনে। সামনেই ছিল বিশাল মাঠ। সুন্দর, সবুজ। আমরা দলবেধে সকালে ক্লাসে যেতাম, আর বিকেলে খেলতে। বৃষ্টি হলে মাঠে প্রায় হাঁটু সমান পানি জমতো। গায়ে কাদা মেখে খালি পায়ে ফুটবল খেলা চলত। শীতে ক্রিকেট। উভয় খেলাতেই মাঠ মাতাতেন পূর্বপাড়ার রব ভাই। তিনি ছিলেন আমাদের অঘোষিত অধিনায়ক। মাঠের বাইরেও অনেকে তাকে গুরু মানতো। সমীহ করে চলতো। রব ভাই ছিলেন স্বাধীনচেতা, ক্রীড়া প্রেমী, সকল কাজের কাজি। পড়াশোনায় কিছুটা খামখেয়ালি হলেও খেলাধুলায় ছিলেন সিরিয়াস। অভিভাবকসুলভ একটা ভাব ছিল তার মধ্যে। একদিন মাঠে না আসলেই পরেরদিন চোখ বড়ো করে বলতেন–

‘এই তোগো সমস্যা কি বলতো? মাঠে আসছ না ক্যান? খেলাধুলা এত সহজ না বুঝলি, মন দিয়ে খেলতে হয়।’

রব ভাইয়ের কথা মেনে আমরা মন দিয়ে খেলাধুলা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। বেলা গড়ালেই মাঠে হাজির। হঠাৎ করেই কয়েকজন মাঠে আসা বন্ধ করে দিলো!

অনেকে কানাকানি করছে-পুরানো স্কুল ভবন থেকে নাকি রাতে অস্বাভাবিক শব্দ আসে, মাঝে মাঝে কান্নার আওয়াজও কানে আসে। কেউ কেউ তিলকে তাল করে প্রচার করল 'ওখানে আসলে ভূতের আসর বসে। সম্ভবত ভূতরা কাউকে আটকে রেখেছে।' কান কথা শুনে আমাদের অনেককেই বাড়িতে আটকে রাখা হলো। গ্রামে এক প্রকার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। মাঠে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। রব ভাই বুঝিয়েসুঝিয়ে সবাইকে মাঠে ফেরাতে পারলেন না। উলটা অনেক অভিভাবক পালটা কথা শুনিয়ে দিলেন। রব ভাই পাত্তা না পেয়ে অনেকটা নীরব হয়ে গেলেন। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ, কী করা যায়?

পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে পরের দিন জরুরি সভা ডাকা হলো মকবুল স্যারের বাড়িতে। মকবুল স্যার ছিলেন স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক; আমাদের অভিভাবক। যে-কোনো পরামর্শে আমরা স্যারের কাছে দৌড়ে যেতাম। সেদিনও রব ভাইয়ের ডাকে দৌড়ে হাজির হলাম। তবে দেখে মনে হলো– 'বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বেঁধে রাখা যায় না'। চশমার ফ্রেমের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে তিনি আমাদের কথা শুনছেন। স্যারের চোখ চকচক করছে। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন। একটানা বলার পর রব ভাই বিরতি নিলেন। থমথমে পরিবেশ। সবাই নীরব। পরিশেষে স্যার মুখ খুললেন–'পুরো ঘটনা শুনে আমি খুব মর্মাহত, আবার খুশিও'।

স্যারের কথা মাথার ওপর দিয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মকবুল স্যার বললেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো পবিত্র ভবন এভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় এতদিন ফেলে রাখা হয়েছে। আবার ভূতের আখড়া আখ্যায়িত করে আতঙ্ক ছড়ানো অত্যন্ত লজ্জাকর। তবে আমি খুব খুশি যে, তোমরা এ নিয়ে ভাবছ, সমাধানের জন্য চেষ্টা করছ।'

-'কিন্তু স্যার সেভাবে সাড়া পাচ্ছি না'! হতাশার সুরে রব ভাই জানালেন। মকবুল স্যার কবি গুরুর কবিতা আওড়ালেন–

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'।

কচি বয়সে আমরা স্যারের কবিতার ভাবার্থ ভালোমতো না বুঝেই মাথা দুলিয়ে সহমত প্রকাশ করলাম। রব ভাই ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন,

'কিন্তু স্যার আসলে সমস্যাটা ভূতের নয়, মানুষের। গ্রামের কিছু খারাপ ছেলে সন্ধ্যার পর ওখানে আড্ডা দেয়, নেশা করে। ওরা চায় না যাতে কেউ বাধা দিক। এজন্য ভূতের ভয় দেখাচ্ছে, গুজব রটাচ্ছে।'

স্যার আবার খানিকক্ষণ চুপ থাকলেন। বিজ্ঞের মতো ভঙ্গি করে বললেন– 'আমি তো জানি'।

-জানেন স্যার! আপনি জেনেও চুপ করে আছেন? রব ভাই উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। স্যার পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন–

-কী করতে চাও তোমরা? কিছু ভেবেছো'?

-সেজন্যই তো আপনার কাছে আসা। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

-শোনো একটা গল্প বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। একটা বালতি যদি দীর্ঘদিন খালি ফেলে রাখো তাহলে কী হবে? মশা-মাছি, পোকা-মাকড় বাসা বাঁধবে, ময়লা জমবে-তাই তো?

-জি স্যার

-তাহলে কী করতে হবে?

-ভালো কিছু রাখতে হবে, খালি রাখা যাবে না।

-ভেরি গুড, এখন বলো কী করবে? মাথা খাটাও।

আমরা মাথা চুলকাতে লাগলাম। কয়েকজন এলোমেলো কিছু প্রস্তাব করল– ধোপে টিকল না। রব ভাই সিরিয়াস ভঙ্গিতে ভাবতে থাকলেন, সমাধান দিতে পারলেন না। স্যারের দিকে তাকিয়ে

অনুরোধের সুরে বললেন 'স্যার, আপনিই বলেন। যা বলবেন, সবাই মিলে তাই করব আমরা' 'তোমরা এক কাজ করতে পারো, পুরানো রুমটা পরিষ্কার করে লাইব্রেরি করে ফেলো। সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সময় করে আসবে, পড়বে, শুনবে, শিখবে' রব ভাই ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠলেন। ফরিদ মিউ মিউ করতে লাগল। জালাল জানালো কয়েকদিন ধরে তার পেট ভালো না। আরও বেশ কয়েকজন কাঁচুমাচু করতে থাকল। আমি নীরবতা বেছে নিলাম। রব ভাই রাগে গোঁ গোঁ করতে থাকলেন। মকবুল স্যার সবার দিকে তাকিয়ে উচ্চৈস্বরে সুর করে উঠলেন ' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে...'

সেদিন সভা শেষে রব ভাই নীরবে একাকী বের হয়ে গেলেন। বাকিরা যে যার মতো বাড়ি ফিরল। কদিন মাঠেও কেউ গেল না। বেশ কিছুদিন পর সরাসরি পুরানো ভবনে যেতে বলা হলো। শুক্রবার ছুটির দিন ভোর থেকেই একজন দুজন করে আসতে থাকল। আমি গিয়ে দেখি বন্ধুদের বেশ কয়েকজন হাজির। মকবুল স্যার এই বয়সে মাথায় গামছা বেঁধে কাজে নেমে পড়েছেন। রব ভাই বালতি ও দড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করছেন। পাশেই ছোটো পুকুর। স্কুলের দপ্তরি জাফর চাচাকেও ডাকা হয়েছে। দেখলাম যারা না না করছিল তারাও এসেছে। সাথে অনেক অভিভাবকও হাজির হয়েছেন। উৎসবমুখর পরিবেশ। কারো মনে যেন ভয়, শঙ্কা বা সংকোচ নেই। সবাই কাজে নেমে পড়ল। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল। মকবুল স্যারের বাড়ি থেকে একটা টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার আনা হয়েছে। কিছু বইপত্রও এনেছে কয়েকজন। ভিতরে সাজিয়ে রাখা হলো। বাইরে একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে লেখা ছিল 'উন্মুক্ত লাইব্রেরি'।

দুই যুগ আগের সেই দিনগুলোতে গ্রামের ওই অনন্য উদ্যোগের কথা মনে উঠলেই মন এখনো আন্দোলিত হয়, আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে মন। গুনগুন করে গাইতে থাকি... আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। ■

প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক ও যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

নৌকা ও মাঝি

মুহাম্মদ ইসমাঈল

আমাদের একটি নদীর নাম খুব মনে পড়ে। গন্ধবপুর চর পেরিয়ে কিছুদূর গেলে নদীটি দেখা যায়। নদীর নাম ডাকাতিয়া। তোমরা হয়ত ভাবছ ডাকাতিয়া নদী মানে ডাকাতদের নদী। না বন্ধুরা, ডাকাতিয়া নদী ডাকাতদের নামানুসারে রাখা হয়নি। এক সময় বেশি বেশি করে নদীটির পাড় ভাঙত তাই নদীটির নাম ডাকাতিয়া নদী। এ নদীটি খুব শান্ত। নিরিবিলি নদী। দুই পাশে লকলক করে দুলছে লতানো গাছেরা। সবুজ সবুজ অবুঝ পাতা। নদীটি টইটম্বুর ছিল কচুরিপানায়। কচুরিপানার জন্য মাঝিদের নৌকা বাইতে অনেক কষ্ট হতো।

নদীটির পাশে কাশবন ছিল, ছিল অন্যান্য ছোটো গাছ। গাছে গাছে পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যেত। আমাদের বাড়িটা নদীটির পাশে। বাড়ির আশেপাশে অনেক হিজল গাছ ছিল। গাছের নিচে বসে নদীর কাঁপন অনুভব করতাম। নদী কেমন? নদী কোথা থেকে আসে ? নদী কোথায় যায় ? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। সেই নদীতে ছোটোবেলায় গোসল করেছি। গরু নিয়ে এপার থেকে ওপার গিয়েছি। নদীতে সারি সারি নৌকা চলছে। নৌকার মাঝিরা চুলা জ্বালিয়ে রান্না করছে। ওরা নৌকায় থাকে নৌকায় ঘুমায়, নৌকায় রান্না করে। নৌকায় গান গায়। গন্তব্যে ওরা কবে পৌঁছাবে কেউ জানে না। নৌকা বোঝাই মালপত্র। এ মাল তারা পৌঁছে দেবে এক ঘাট থেকে

অন্য ঘাটে। নৌকার মাঝিদের বিচিত্র জীবন দেখে আমি ভাবতাম একদিন আমিও নৌকার মাঝি হব। নৌকা চালিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাব। কত আনন্দ হবে হি হি হি তাই না ?

বাবা বলতেন, এবার জন্মদিনে তোমাকে কী কিনে দেবো আনাস? আমি বলতাম ছোটো একটি নৌকা। বাবা হাসতেন। নৌকা চালাবি কোথায় ? নৌকা চালানোর কোনো অবস্থা আগের মতো নেই। এখন সব রাস্তাঘাট হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বললাম, হেঁটে হেঁটে চলে যাব গন্ধবপুর চরে। সরু ডাকাতিয়া নদী দিয়ে চলে যাব দূরের ঘাটে। বাবা হাসতেন। মজা পেতেন, মাও উঁকি মেরে মেরে দেখতেন এবং হাসতেন। আমি নৌকার মাঝি হব বলে।

কেউ পাখি হতে চায়- আকাশে উড়বে বলে।
কেউ ফুল হতে চায়- গন্ধ ছড়াবে বলে।
কেউ প্রজাপতি হতে চায়- ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াবে বলে।
কেউ পড়তে চায়- বড়ো হবে বলে।
আমি কিন্তু শুধু মাঝি হতে চাই। নৌকা চালাবো বলে। নদীর বুক দিয়ে আমার নৌকা এগিয়ে যাবে দেশ থেকে দেশান্তরে। আমি মজা পাবো। শান্তি পাবো। এজন্য আমি মাঝি হতে চাই। ■

গল্পকার

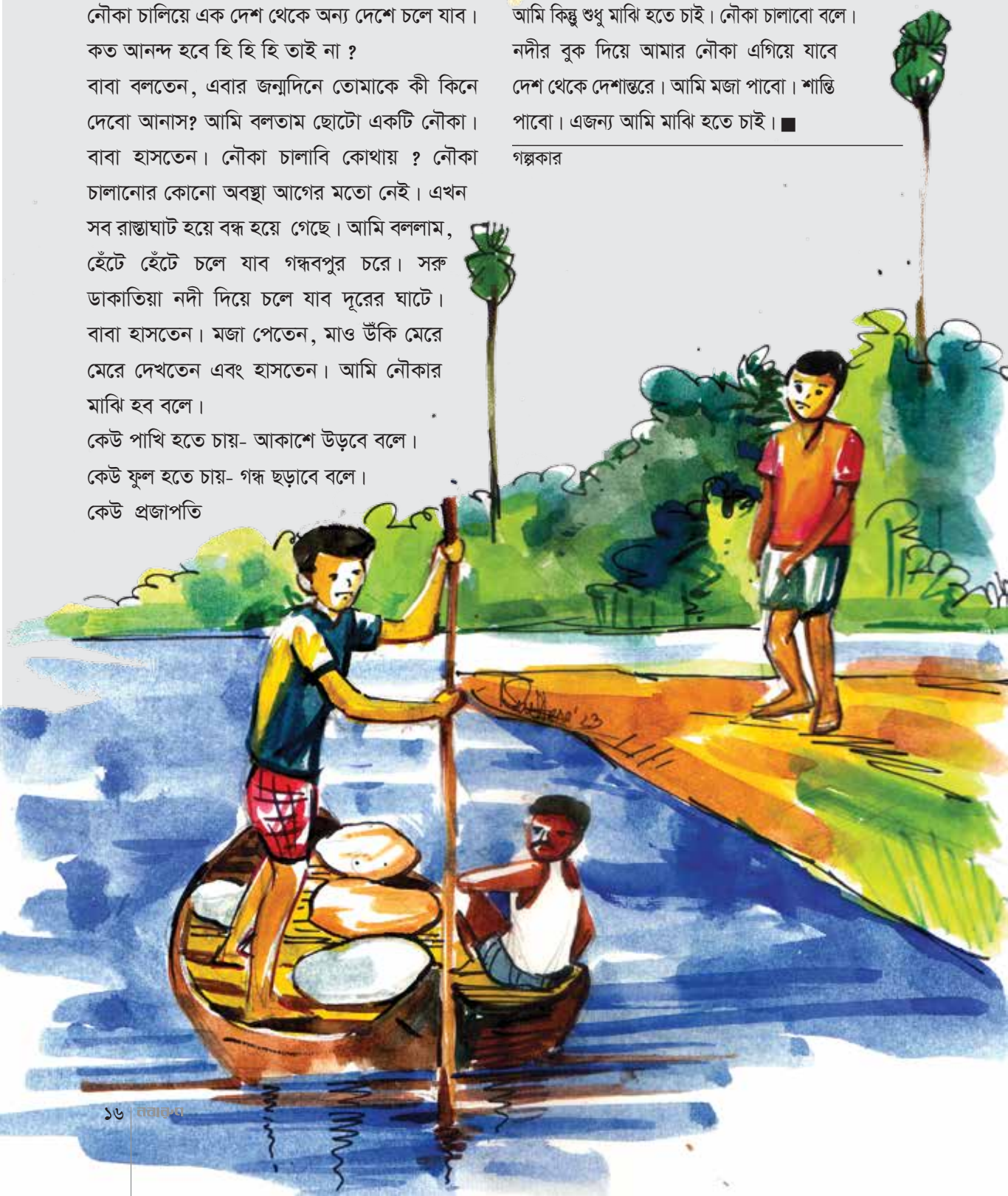

বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি

ইশরাত জাহান

লাল-সবুজের দেশ আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। দেশের দক্ষিণভাগে এক সময়ের স্রোতস্বিনী মধুমতির কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে টুঙ্গিপাড়া। যার বুক জুড়ে রয়েছে স্বচ্ছ জলের ধারা বাইগার নদী। আছে মাছে-ভাতে বাঙালির হরেক রকম মাছের আধার বর্নি বাওড়। আরো আছে নানারকম ফসল উৎপাদনের জন্য বিস্তীর্ণ বিল-চরাঞ্চল।

একটি পৌরসভা ও পাঁচটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত টুঙ্গিপাড়ার নামকরণে রয়েছে অভিনবত্ব। শোনা যায়, পারস্য এলাকা থেকে আগত কতিপয় মুসলিম সাধক অত্র এলাকার প্লাবিত অঞ্চলে টং বেধে বসবাস করতে থাকেন এবং কালক্রমে ওই নাম থেকে এই গ্রামের নাম হয় টুঙ্গিপাড়া। আয়তনে ছোটো এবং নামে অভিনবত্ব থাকলেও বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টুঙ্গিপাড়ার রয়েছে গৌরবদীপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় দুরন্ত শৈশব-কৈশোর কেটেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ছায়াঢাকা গ্রাম আর এখানকার মায়া ভরা মানুষগুলোর প্রভাব রয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবনে, মননে। সবুজ-শ্যামল আর মধুমতির তীরের টুঙ্গিপাড়ায় গাছগাছালি, নদীর স্বচ্ছ জলে একাকার বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা। রাজনীতির টানে এখানে তিনি ফিরে এসেছেন বারবার। এখানেই রয়েছে তাঁর সমাধি।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের

বাইগার নদীর তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে বঙ্গবন্ধু তৃতীয় সন্তান। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে তরুণ নেতা শেখ মুজিব যখন ঢাকা থেকে নিজ বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় যেতেন, তখন তাঁর যাত্রার একমাত্র বাহন ছিল স্টিমার। টুঙ্গিপাড়ার মধুমতি নদীপাড়ের পাটগাতি লঞ্চঘাট অথবা বাইগার নদীর পাড়ের লঞ্চঘাটে নামতেন তিনি। তাঁর শৈশব কেটেছে টুঙ্গিপাড়ার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলা গায়ে মেখে। তাঁর ছোটো মনে আসত নানা ভাবনা- বাবুই কীভাবে বাসা বানায়, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, দোয়েল পাখির বাসা কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। দোয়েলের সুমধুর গানে তিনি আকৃষ্ট হতেন খুব।

মাঠে-ঘাটে বঙ্গবন্ধু ঘুরে বেড়াতেন, গ্রামের হিজল গাছের তলায় বসে মানুষের সাথে আড্ডা দিতেন, সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন দরদের সাথে। সেই হিজল গাছ এখনো এই স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির শিক্ষা অর্থাৎ গৃহশিক্ষা শেষে বঙ্গবন্ধু সেখানকার গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁরই পূর্বপুরুষেরা এই বিদ্যালয় গড়েন। একবার বর্ষাকালে স্কুলে যাবার সময় তিনি নৌকা থেকে নদীতে পড়ে যান। তাঁর দাদি তখন তাঁকে আর ওই স্কুলে যেতে দেননি। এরপর তাঁর ঠিকানা হয় বাবার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ শহরের মথুরানাথ ইনসটিটিউট মিশন স্কুলে। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। আই এ পড়েন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। সাতচল্লিশে দেশ ভাগের পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে টুঙ্গিপাড়া গ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের জন্য এই গ্রাম্য পরিবেশ বেশ সহায়ক বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের সবচেয়ে ছোটো জেলা মেহেরপুর। বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোটো জেলা হিসেবে পরিচিত এ জেলা। তবে এই জেলার ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরের পুরনো এবং অত্যন্ত গৌরবোজ্জল। বাংলাদেশের জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে মেহেরপুরের মুজিবনগর।

ছোটো জেলা হলেও মেহেরপুর জেলাটিতে প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে নানান স্থাপনা, যেগুলো মেহেরপুরকে করেছে ঐতিহাসিক ও সমৃদ্ধ। মেহেরপুরে রয়েছে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স, আমঝুপি নীলকুঠি, ভবানন্দপুর মন্দির, স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম, মেহেরপুর পৌর কবরস্থান, মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি। বিভিন্ন স্থাপনার ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুর শহরের মূল প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোয়ালা চৌধুরী খেতাবপ্রাপ্ত রাজার পুত্র।

মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননটি মেহেরপুর জেলা থেকে প্রায় ১৪ কি. মি. দক্ষিণে। এটি জমিদার বৈদ্যনাথের আমবাগান। ঘন আমবাগানের কারণে যুদ্ধের সময় এখানে সেভাবে ক্ষতি হয়নি বা বড়ো যুদ্ধ হয়নি। কারণ পাশেই ছিল ভারতের সীমানা। হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছুড়ে নির্দিষ্টভাবে কাউকে ঘায়েল করা কঠিন, নিশানা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এর ওপর ভারতের সীমায় কোনো গুলি পড়লে বিশাল যুদ্ধ বেধে যেতে পারত। তাই মুক্তিবাহিনীর জন্য এ স্থানটি নিরাপদ ছিল।

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের চিরস্মরণীয় একটি দিন ১৭ই এপ্রিল। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন এমন দিনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে (পরে এই বৈদ্যনাথতলাকেই ঐতিহাসিক মুজিবনগর হিসেবে নামকরণ করা হয়)।

১৭ই এপ্রিল অসংখ্য সাংবাদিক, বেতার-টিভি প্রতিনিধি, আমন্ত্রিত অতিথি এবং ব্যাপক জনসমাগমের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ শপথ নিয়েছিলেন। শপথ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করা হয়। এই ঘোষণার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সংবিধান পরবর্তীকালে রচিত হয়। এই ঘোষণাপত্র আমাদের ম্যাগনাকার্টা, স্বাধীনতার সনদ। এই ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কোন কোন ক্ষমতাবলে এবং পরিস্থিতিতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। যে রাষ্ট্রের নাম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। যেহেতু এই সরকার মুজিবনগরে তার প্রধান দপ্তর স্থাপন করেছিল তাই এর ব্যাপক পরিচিতি হলো মুজিবনগর সরকার রূপে। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে এই সরকারের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থাপন করা হয় প্রধানত নিরাপত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নির্বিঘ্নে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনে। সনদপত্রটি বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সাংবিধানিক, সর্বোপরি শাসনা তান্ত্রিক রূপরেখাও বিবৃত হয়েছে এই সনদপত্রে। এর ভিত্তিতে আইনানুগ ভিত্তি পেয়েছিল সরকার। এ সনদে জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করেছে। ■

সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

টুঙ্গিপাড়া

নূরুন নাহার সামিরা

মধুমতি নদীর তীরে
গ্রাম টুঙ্গিপাড়া নাম
এ গ্রামে জন্মেছিলেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খোকা নামে ডাকত সবাই
অনেক অদর করে
তাঁর সুনাম ছড়িয়ে গেছে
সারা বিশ্ব জুড়ে।

নবম শ্রেণি, মডার্ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা

মেঘের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু গ্রাম

ডালিয়া ইয়াসমিন

বন্ধুরা একটু ভাবো, তুমি বাস করো মেঘের মধ্যে অবস্থিত কোনো এক গ্রামে। সারা বছরই মেঘ থাকে । ঘরের সামনে বা মাচার উপর দাঁড়িয়ে স্পর্শ করতে পারবে মেঘ, চাইলে হা করে গিলে নিমিষেই ভেতরটা শীতল করতে পারবে। ঘনঘোর বর্ষায় পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে নিচে বিদ্যুৎ চমকানো দেখতে পাবে। নিচ থেকে বৃষ্টির শব্দও শুনতে পাবে। কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি! তাই না? এমন এক গ্রামের গল্প শোনাবো তোমাদের।

পাসিং পাড়া, বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু গ্রাম। ৩ হাজার ৬৫ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই গ্রামটি। আমাদের দেশে এত উঁচুতে আর কোনো গ্রাম নেই। এই গ্রামটির অবস্থান মেঘের মধ্যে। সারা বছর মেঘের ভেতরেই থাকে পাসিং পাড়ার লোকজন। আশপাশের সমস্ত চরাচর যেন একটা মেঘের সমুদ্র। বাংলাদেশের অন্যতম উঁচু কেওক্রাডং পর্বতশৃঙ্গের চূড়া থেকে নেমে যে গ্রামটি দেখা যায় তার নাম পাসিং পাড়া। বান্দরবানের রুমা উপজেলায় অবস্থিত কেওক্রাডং পাহাড়ের চূড়া থেকে পশ্চিম দিকে কয়েক ফুট নিচে নেমে দক্ষিণ দিকে যে পথ গেছে, সেই পথ ধরে

কয়েক মিনিট হেঁটে গেলেই চোখে পড়বে এই গ্রামটি। গ্রামটি বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু গ্রাম বলে পরিচিত। গ্রামটির প্রবেশদ্বার কাঠ-বাঁশ ও বেড়া দিয়ে আটকানো। প্রবেশের জন্য বানানো আছে একটি ফটক। সুন্দর ছিমছাম গোছানো পরিচ্ছন্ন একটি গ্রাম! এখানে বারো মাসই মেঘ ঘুরে বেড়ায়। উঠানে শিশুরা খেলে সাথে মেঘও খেলে, মেঘের সাথে রয়েছে তাদের নিত্যদিনের বন্ধুত্ব। মেঘ এই পাড়ার অতিথি নয়, সহবাসিন্দা। এক সাথেই থাকে তারা! চারিদিকে সবুজ পাহাড় আর পাহাড়। ওই সব পাহাড়ে আছে নানারকম বন্যপ্রাণী। গ্রামের কেউ কেউ গোদা বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝেই শিকারে যায়।

গ্রামটির কারবারি বা পাড়া প্রধান পাসিং ম্রোর নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম পাসিং পাড়া হয়েছে। এই গ্রামে বাস করে ৫০ থেকে ৬০টি পরিবার। গ্রামের সবাই ম্রো সম্প্রদায়ের মানুষ। এই গ্রামের মানুষ খুবই সহজ-সরল এবং পরিশ্রমী। তারা জীবিকার জন্য মূলত জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। কেউ কেউ শিকারও করেন। ম্রো জাতির জন্য ক্রামা ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন মেনলে ম্রো। মাত্র ৩৮ বছর আগে এই জনপদে ক্রামা নামে নতুন একটি ধর্মের আর্বিভাব হয় ম্রো বর্ণমালাসহ! ম্রো সম্প্রদায়ের অনেক মানুষই এই ধর্মের অনুসারী। পাসিং পাড়ার ৩ ভাগের দুই ভাগ মানুষই ক্রামা ধর্মের অনুসারী। বাকিদের ভেতর অর্ধেক খ্রিষ্টান এবং অর্ধেক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। মেনদ্রো ম্রো এই গ্রামের প্রবীণদের একজন। তিনি এক সময় বিজিবিতে কর্মরত ছিলেন। মেনদ্রো গ্রামের ক্রামা ধর্মের ধর্মগুরু। ছোটো একটি প্রার্থনালয়ও আছে তাদের।

ম্রো সমাজে জুম চাষ শেষ হলে যখন কাজ থাকে না তখন গ্রামের বৃদ্ধরা গল্প শোনায় শিশু-কিশোর-তরুণদের। এই গল্প শুধু রূপকথাই না, গল্পে গল্পে মূলত সামাজিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন তিনি। ম্রো সমাজের অনেক রীতিনীতি সংস্কৃতি উঠে আসে এইসব গল্পে। গ্রামের এই গল্প কথক বৃদ্ধদের অনেকটা সামাজিক শিক্ষক বলা যায়।

আগে এই গ্রামে পর্যটকরা বেড়াতে আসতে পারলেও এখন আর সেই সুযোগ নেই। পর্যটকদের নিরাপত্তার অভাবের কথা বলেই এই গ্রামে প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। তাই গত কয়েক বছর যাবত পর্যটকদের কেওক্রাডংয়ের চূড়ায় এসে থেমে যেতে হয়। মাত্র একশ ফুট নিচে ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামে তারা আর যেতে পারেন না।

রংতুলিতে আঁকা 'আলপনা' গ্রাম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার ছোট্ট একটা গ্রামের নাম টিকইল। টিকইল গ্রামের প্রতিটি দেয়াল যেন উন্মুক্ত ক্যানভাস। সেই ক্যানভাসে টিকইল গ্রামের মানুষগুলো ফুটিয়ে তোলেন নান্দনিক সব আলপনা। তাই গ্রামটি দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষের কাছে 'আলপনা গ্রাম' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী ইলা মিত্রের স্মৃতিধন্য নাচোল উপজেলার নেজামপুর ইউনিয়নের গ্রাম টিকইল। হিন্দু-অধ্যুষিত এ গ্রামের প্রতিটি বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে শোভা পায় হাতে আঁকা নানা

আলপনা। তুলির আঁচড়ে রঙিন হয়ে উঠে মাটির তৈরি প্রতিটি বাড়ির দেয়াল এমনকি আলপনার ছোঁয়া থেকে রান্নাঘরও বাদ যায় না। আলপনাগুলো মূলত গ্রামের গৃহিণী ও মেয়েরা অঙ্কন করে থাকে। টিকইল গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে আলপনার ধরন আলাদা আলাদা। এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির আলপনার কোনো মিল নেই।

তবে বাড়ির উঠানে আলপনা আঁকা থেকে আলপনা গ্রাম হয়ে উঠার গল্প একটু আলাদা। এর পিছনে

রয়েছেন ওই গ্রামের বাসিন্দা দেখন বর্মণ। তিনি বাসুদেব বর্মণের স্ত্রী। মূলত দেখন বর্মণের হাত ধরে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন রঙের, বাহারি আলপনার প্রচলন ও প্রসার হয়েছে। তার দেখাদেখি গত কয়েক বছর ধরে এ গ্রামের প্রতিটি বাড়ির বেশিরভাগ দেয়ালেই আলপনা জায়গা করে নিয়েছে। এ কারণে দেখনকে আলপনার উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জেলা প্রশাসন। তাঁর বাড়িকে সবাই 'আলপনা বাড়ি' নামে ডাকে।

মাটির ঘরে আলপনাগুলো আঁকা হয় নিজেদের তৈরি করা রং দিয়ে এবং আলপনা আঁকার প্রধান কাঁচামাল আসে মাটি থেকেই। এক সময় এসব আলপনা আঁকার জন্য চক (খড়িমাটি), গিরিমাটি, রং এবং তারপিন তেল ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সেইসব আলপনার স্থায়িত্ব ছিল কম, তাই বর্তমানে গিরিমাটি, শুকনা বরই চুর্ণ আঠা, আমের পুরাতন আঁটির শাঁস চুর্ণ, চকগুঁড়া, বিভিন্ন রং, মানকচু ও কলা গাছের কষ দিয়ে তৈরি মিশ্রণকে ৪ থেকে ৫ দিন ভিজিয়ে রেখে আলপনা আঁকা হয়। আর এই আলপনা টিকে প্রায় এক বছরেরও বেশি সময়।

রৌদ্রজ্জ্বল কিংবা ঝড়-বৃষ্টিমুখর প্রায় সব মৌসুমেই এই গ্রামে শোভা পায় রং-বেরঙের আলপনা। শুধু আলপনা আঁকাতেই সীমাবদ্ধ নয় গ্রামের বাসিন্দাদের কসরত, আলপনা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য সমান তালে লক্ষ্য রাখেন আবহাওয়ার দিকেও। বৃষ্টি আসার আভাস পেলেই পলিথিন মুড়ে দেন দেয়ালে-উঠোনে। রং ফিকে হয়ে গেলে কখনো পুনরায় রং করেন আবার কখনো নতুন আলপনা আঁকেন। এভাবেই চলছে আলপনা গ্রামের পরম্পরা। আলপনা যেন গ্রামের একটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। গ্রামের ছোটো থেকে বড়ো সবাই মেতে উঠে রঙের উৎসবে।

স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন এসব আলপনায় বাড়িঘরে পবিত্রতা আসে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের মন প্রফুল্ল থাকে। তবে কীভাবে টিকইল গ্রামে এমন ঐতিহ্যের জন্ম হলো সেই সম্পর্কে গ্রামের মানুষের তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা নেই। পূজা-পার্বণে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ির দেয়ালগুলোতে সাদা রঙের ফোঁটার নিচে দাগ দিয়ে আলপনা আঁকা হতো। বিবাহ যোগ্য পাত্রীর বাড়িতেও দেখা যেত নানা রঙে রাঙানো বাড়ির উঠোন-দেয়াল। সেই প্রচলন থেকেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম অঙ্কন ধারা বজায় রেখেছে। এখন গ্রামটির সব পরিবারেই আলপনার শোভা দেখা যায়। এক সময় বাড়ির আলপনার সৌন্দর্য বিচার করে সেই পরিবার থেকে পাত্র অথবা পাত্রী নির্বাচন করতেন বয়োজ্যেষ্ঠরা।

আলপনা গ্রামের আরেক বিশেষত্ব হলো, যেসব প্রকৃতিপ্রিয় দর্শনার্থী সেখানে যান তাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করা হয় বাসু বর্মণের পরিদর্শন খাতায় তাদের মন্তব্য লেখার জন্য। দেশ-বিদেশের যত ভ্রমণপিপাসু ব্যক্তি সেখানে গিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের অনুভূতির রেশ রেখে গেছেন সেই খাতায়।

টিকইল গ্রামের লোকেরা আশা করেন, একদিন তাদের আলপনার ঐতিহ্য আশেপাশের গ্রাম এবং সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

রূপপুর এখন রুশপুর

পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ছোঁয়ায় বদলে গেছে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম রূপপুর। এক সময় সন্ধ্যা হলেই যেখানে গাঢ় অন্ধকারে নামত রাত্রির নিস্তব্ধতা। সেখানেই এখন দিন-রাত কর্মচাঞ্চল্য। রাশিয়ানদের পদচারণায় রূপপুর গ্রাম এখন রুশপুর গ্রামে পরিণত হয়েছে।

২০১৫ সালে রূপপুরের নতুন হাট এলাকা ছিল শুধু কাঁটাতারের বেড়া। চারদিকে ধু-ধু ফাঁকা মাঠ আর দুই-একটি অস্থায়ী স্থাপনা। সেই জায়গা এখন হঠাৎ দেখায় রাশিয়ার আধুনিক শহর ভেবে ভুল হয়। প্রায় পাঁচ হাজার রাশিয়ান, বেলারুশ নাগরিকের পদচারণ

বদলে দিয়েছে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক লেখচিত্র। চরের বিরানভূমিতে গড়ে উঠেছে আকাশচুম্বী সুদৃশ্য আবাসিক ভবন, ঝকঝকে শপিংমল, রেস্তোরাঁ ও রিসোর্ট।

গ্রামীণ পরিবেশ বদলের পাশাপাশি রাশিয়ান আর বাঙালির সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ায় বন্ধুত্বপূর্ণ মধুর একটি সম্পর্কও তৈরি হয়েছে। নতুন হাট এলাকায় দেখা যায় বিভিন্ন স্থাপনায় রুশ সংস্কৃতির ছোঁয়া। সাইনবোর্ডে ইংরেজি, বাংলার পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে রুশ ভাষা। রেস্তোরাঁর নাম রাখা হয়েছে রুশ ডাইন, রুশ ফ্যাশন। শুধু রূপপুর নয়, পার্শ্ববর্তী পাকশী, সাহাপুর ও ঈশ্বরদীতেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। পালটে গেছে জীবনচিত্র। বিদেশি সংস্কৃতির ছোঁয়াও লেগেছে জীবনে। ফল ও সবজি বিক্রেতারা শিখেছেন রাশিয়ার ভাষা। রাশিয়ার নাগরিকদের সঙ্গে পণ্য কেনাবেচা করতে করতে তাদের ভাষা শিখেছেন এ দেশীয়রা। দুই দেশ ও দুই ভাষার মানুষ হলেও কেনাবেচায় কোনো সমস্যা নেই। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা যেমন কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো করে বুঝতে পারছেন রুশ ভাষা, তেমনি বাংলা ভাষা বুঝে নিচ্ছেন রাশিয়ার এসব নাগরিক। এভাবে খাবার থেকে শুরু করে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানেও দেখা মেলে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ বিনিময়। তাই বন্ধু বলতে না পারলেও বন্ধু রাশিয়ানদের মুখে ভালোই মানায়।

পদ্মা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ সেতুর পাশেই নদী তীরে চলছে ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকার এই মেগা প্রকল্পের কাজ। এই প্রকল্পে কাজের সুযোগ পেয়েছেন কয়েক হাজার বেকার যুবক। এতে তাদের ভাগ্য বদলের পাশাপাশি বদলে গেছে সামাজিক চিত্রও। এর বাইরে চারপাশে গড়ে ওঠা হোটেল, রিসোর্ট, বিপণিবিতানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও কর্মসংস্থান হয়েছে হাজারো মানুষের।

প্রকল্পের কারণে উপজেলার প্রায় সব এলাকার রাস্তাঘাট নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বড়ো পরিবর্তন। প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই উপজেলায় ১০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে। রূপপুর প্রকল্পের ভারী মালপত্র রেলপথে আনা-নেওয়ার জন্য ৩৩৫ কোটি টাকা খরচে ২৬ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মিত হয়েছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে একসময় আশপাশের গ্রামবাসীর মধ্যে ছিল নানা সংশয় ও উদ্বেগ। তবে প্রকল্পে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান আর দেশি-বিদেশি কর্মীদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক অঞ্চল বদলে দিয়েছে তাদের ভাগ্য। তাই এখন তাদের মুখে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের জয়গান। সম্ভাবনাময় আগামীর মধুর প্রতীক্ষা। ■

সিনিয়র সম্পাদক, নবারুণ ও সচিত্র বাংলাদেশ

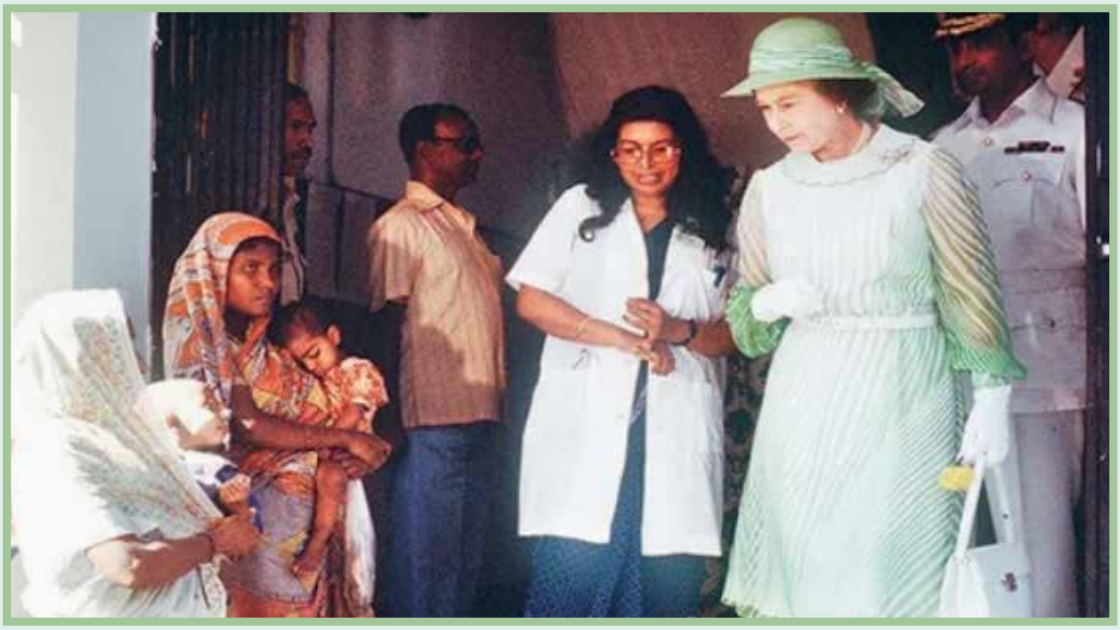

বাংলাদেশের গ্রামে রানি এলিজাবেথ

নুসরাত জাহান

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ১৪ থেকে ১৭ই নভেম্বর অর্থাৎ চার দিনের এই সফরে তিনি ঢাকা থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণে গাজিপুরের শ্রীপুর উপজেলার বৈরাগীরচালা গ্রাম পরিদর্শনে যান। সেই সময় গ্রামটিতে ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছিল। কাঁচা রাস্তাগুলো রাতারাতি পাকা করা হয়। আর গ্রামে প্রথমবার বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হয়। যা এ গ্রামের কলকারখানা গড়ে উঠতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

গ্রামটি পরিদর্শনকালে গ্রামের একটি কাঁঠাল বাগানে স্থানীয় নারীদের সাথে গল্প করেন রানি। এ সময় এক নারী রানিকে একটি রূপার চাবি উপহার দিয়েছিলেন। ওই চাবিটি প্রতীকী অর্থে দেওয়া হয়। এর অর্থ হচ্ছে, যে-কোনো সময় রানি এই বৈরাগীরচালা গ্রামে আসতে পারবেন। তাঁর জন্য গ্রামের সব দরজা সর্বদা খোলা।

এলাকার মানুষের গোয়াল ভরা গরু-ছাগল, খামার ভরা মোরগ-মুরগি, পুকুর ভরা মাছ, ফসলি জমি, শাকসবজি-তরকারি সবই ছিল। কোনো কিছুর অভাব ছিল না এই গ্রামের মানুষের। বাইরে থেকে কিছুই আমদানি করতে হতো না। মূলত: স্বনির্ভর এই গ্রামটি পরিদর্শনে এসেছিলেন ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে রানির সফরের পর থেকে ওই গ্রামের বাসিন্দারা বৈরাগীরচালাকে স্বনির্ভর গ্রাম হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন এবং এখনও তা করেন। এটি ছিল ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের উল্লেখযোগ্য একটি সফর। চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে তিনি জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন।

ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসেলে ২০২২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ৯৬ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে যান। রানির মৃত্যুতে তার স্মৃতিবিজড়িত বৈরাগীরচালা গ্রামের মানুষও শোকাহত হয়ে পড়ে। গ্রামের বাসিন্দা মো. চাঁন মিয়া (৭০) বলেন, রানিকে আমরা দেখেছি, রানির সঙ্গে বসে গল্প করেছি, তাঁর কথা আমরা বুঝিনি তবে তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজন আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। আমাদের ভাগ্য আমরা ব্রিটেনের রানিকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি। তিনি পুকুর ঘুরে

দেখেছেন, কুঁড়েঘর দেখেছেন। তিনি পুকুরে মাছ ছাড়া এবং মাছ ধরা দেখেছেন। হাতে ভাজা মুড়ি বানানো, গ্রামীণ শিল্পের নানা ধরনের উপকরণ তৈরির নমুনা দেখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও ১৯৬১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। বাংলাদেশের জন্য রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্তরে ছিল গভীর ভালোবাসা। তাঁর সেই ভালোবাসার পথ ধরেই বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আশির দশকে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাংলাদেশ সফরের পর একাধিক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণকে দেওয়া শুভেচ্ছা বাণীতে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ বলেন, 'আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার। এটা আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। ৫৩ বছর আগে যা রচিত হয়েছিল।'

যে গ্রামে বউ-শাশুড়ি ভাড়া পাওয়া যায়

বন্ধুরা, তোমরা জেনে অবাক হবে যে, বাংলাদেশে এমন একটি গ্রাম আছে যেখানে বউ থেকে বাচ্চা সব ভাড়ায় পাওয়া যায়। শুধু বউ নয়, বরও ভাড়ায় পাওয়া যায়। হাঁস-মুরগি কিংবা গরু-ছাগল তাও মিলবে এই গ্রামে। যার যেমন দরকার সে তেমন বউ-বর কিনে নিতে পারে। গ্রামটি অদ্ভুত! তবে কাল্পনিক নয়। একেবারে বাস্তব। বাংলাদেশের গাজীপুর জেলা শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভাদুন গ্রাম। এই গ্রামেই বউ থেকে শাশুড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। রোগা, মোটা, লম্বা, বেঁটে, সাদা-কালো যেমন দরকার সব রকম বউ সরবরাহ করে থাকে ভাদুন গ্রাম।

আসলে ভাদুন গ্রাম একটি শুটিং স্পট। সিনেমা, টেলি ড্রামা,নাটক, টিভি সিরিয়ালের জন্য যাবতীয় উপকরণ নিয়ে তৈরি ভাদুন গ্রাম। পরিচালকেরা অন্যত্র না ঘুরে সরাসরি এই গ্রামে চলে আসেন। নিজেদের শুটিং মাফিক বউ-বরসহ যার যা দরকার সব এখানে পেয়ে যান। ভাদুন গ্রামের এই পার্শ্ব অভিনেত্রীদের নিতে হলে নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে হয়। ভাদুন গ্রামে নাটক বা সিনেমার শুটিংয়ের জন্য সবকিছুই ভাড়ায় পাওয়া যায়। এই এলাকায় ৯০-এর দশক থেকে শুরু হয়েছে নাটক-সিনেমার জন্য নিয়মিত শুটিংয়ের কাজ। ভাদুন গ্রামটিকে বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পীদের আবাসিক ভূমি। এ গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই যে-কোনো সময় দেখা হয়ে যাবে কোনো এক অভিনেতা-অভিনেত্রীর। প্রতিদিনই শুটিং থাকে এ গ্রামে। ভাদুন গ্রামে রয়েছে মেঘলা, আকাশ ভিলা, ঐশী সুটিং, বিলভিলা, হাসনাহেনা, শাহিনের বাড়ি, আপন ভূবন, কৃষ্ণচূড়াসহ অজস্র শুটিং স্পট।

শুটিংয়ের প্রয়োজনীয় ঘণ্টাভিত্তিক কিংবা সারাদিনের জন্য বউ, বাচ্চা, নাপিত, কামার, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, ঝাড়ু, দাসহ সবকিছুই ভাড়ায় পাওয়া যায় এই গ্রামে।

সালাউদ্দিন লাভলু পরিচালিত হাড়কিপ্টা, সাকিন, সারিসুরি, গরুচোর, পত্রমিতালী, কলেজ স্টুডেন্ট, ঢোলের বাদ্যি, ঘর কুটুম, আলতা সুন্দরী, ওয়ারেন নাটকগুলো প্রচারিত হবার পর তা ব্যাপকভাবে দর্শকপ্রিয়তা পায়। ভাদুন গ্রামে মূলত দিনের হিসাবে বা ঘণ্টার হিসেবে সবকিছু ভাড়া পাওয়া যায়। যে-কোনো পরিচালক তার চাহিদা মাফিক ভাড়া পেয়ে থাকেন। ■

সম্পাদক, নবারুণ

সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম

মেজবাউল হক

এখানকার প্রতিটি গ্রামই যেন সবুজের লীলাভূমি। এখানে যেমন রয়েছে নীল জলরাশির হাওর, ঠিক তেমনি আছে উঁচুনিচু অনেক টিলা। বেশির ভাগ গ্রামই পাহাড়ঘেঁষা। গ্রামের সবুজ প্রকৃতি প্রতিটি হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেয়। আর এখানেই রয়েছে বাংলাদেশের সুন্দর গ্রাম 'পানতুমাই'। এর স্থানীয় নাম 'পাংথুমাই'। বাংলাদেশে এত চমৎকার, নৈসর্গিক একটি গ্রাম আছে তা অনেকেই জানে না। এটি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের একটি গ্রাম। যা ভারত সীমান্তের মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। দিগন্তজুড়ে সবুজ মাঠ আর গ্রামঘেঁষা মেঘালয়ের পাহাড় গ্রামটিকে দিয়েছে এক অনন্য সৌন্দর্য।

ভারতের মেঘালয়ের গহীন অরণ্য থেকে বাংলাদেশে নেমে এসেছে অপরূপ ঝরনাধারা। স্থানীয় নাম ফাটাছড়ির ঝরনা। ঝরনাটি ভারতের মধ্যে পড়লেও পিয়াইন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে উপভোগ করা যায় ঝরনাটি। সীমানার কাছে যাওয়া বিপদজনক। তবে কাছে না গিয়েও ঝরনার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় সহজেই। নয়নাভিরাম, অপূর্ব, অসাধারণ, নান্দনিক সব শব্দগুলো এই গ্রামের সঙ্গে লাগালেও 'পানতুমাই' সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ শেষ হবে না। নানান ফলজ ও বনজ গাছপালায় সুসজ্জিত এ গ্রামটি। তবে বেশি রয়েছে সুপারি গাছ। পাখির কলকাকলিতে সব সময়ই মুখর থাকে গ্রামটি। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। নবারুণের বন্ধুরা, তোমরা ছুটিতে দেখো আসতে পারো বাংলাদেশের সুন্দর এই গ্রামটিকে। সিলেট শহর থেকে সড়কপথে সহজেই পানতুমাই যাওয়া যায়।

পরিচ্ছন্ন গ্রাম

গ্রামের নাম মুনলাইপাড়া। এটি বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় অবস্থিত। সাধারণ জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে পাড়াটি। প্রতিটি বাড়িই গোছালো, নান্দনিক এবং ছিমছাম। মাচাং করে কাঠ দিয়ে বানানো বাড়িগুলো দেখতেও চমৎকার। বাড়িগুলো অর্কিডসহ বিভিন্ন ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো। বাড়ির উঠোন, বারান্দাগুলো কিংবা ঘরের ভেতরে সবখানে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন আকারের গাছ লাগানোর টব। কোনোটা ঝোলানো, কোনোটা আবার মাটিতে রাখা আছে। ঘরের ভেতরটাও বেশ পরিপাটি। গ্রামের রাস্তাগুলোতেও নেই কোনো ময়লা-আবর্জনা। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। গ্রামটি অনেকটা ইংরেজি এম আকৃতির মতো দেখতে। যে কাউকে সহজেই মুগ্ধ করবে। এরই মধ্যে মুনলাই দেশের অন্যতম 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বান্দরবানের রুমা উপজেলা থেকে তিন কিলোমিটারের পাহাড়ি পথ পেরুলে দেখা মিলবে মুনলাই পাড়ার। বগালেকে যাওয়ার পথে পড়বে রাস্তার দুই ধার ঘেঁষা পাড়াটি। অন্য পাড়ার তুলনায় এটি অনেকটা আলাদা। গ্রামটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে দারুণ সব উদ্যোগ নিয়েছে মুনলাইপাড়া কমিউনিটি ট্যুরিজম কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় ৩০টি বম পরিবার সুনসংপাড়া থেকে এসে জনপ্রতি পাঁচ একর করে জায়গা নিয়ে মুনলাইপাড়ায় বসবাস শুরু করে। এখন ৫৮টি পরিবার এ পাড়ায় বসবাস করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এখানে একটি মুনলাই সেন্টার নির্মাণ করেছে। গ্রাম কমিটির সভাপতি থুয়াম লিয়ান বম বলেন, একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন গ্রাম করতে আমরা একমত। বাড়ির অভ্যন্তরে কিংবা উঠোন, সবখানে পরিচ্ছন্নতার ছাপ। ছোটো-বড়ো সব আয়োজন আমরা সম্মিলিতভাবে করি। আমাদের ঐক্য গ্রামের মূল হাতিয়ার। গত তিন বছর ধরে এ পাড়ায় কাজ করছে বেসক্যাম্প বাংলাদেশ। তারা মুনলাই পাড়ায় পর্যটনের মূল উদ্যোক্তা। মুনলাই পাড়ার ট্যুরিজমের সমন্বয়ক ও স্থপতি শাহরিয়াজ আলম বলেন, আমরা একটা স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছি। একদিন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে মুনলাইপাড়া। ■

জনমানব শূন্য গ্রাম

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ঝিনাইদহ শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে কোটচাঁদপুর উপজেলার এলান্দি ইউনিয়নের মঙ্গলপুর গ্রাম। এই গ্রাম জুড়ে রয়েছে অসংখ্য বাড়িঘর, জমিতে রয়েছে বিভিন্ন ফসল। গ্রামের পুকুরগুলোতেও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। তবে মাইলের পর মাইল হাঁটলেও এই গ্রামে চোখে পড়বে না কোনো জনমানব। জানা যায়, প্রায় ৮০ বছর যাবৎ এই গ্রামে কোনো জনবসতি নেই।

আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা যায়, প্রায় শত বছর আগে এই গ্রামটিও আর পাঁচটা গ্রামের মতোই ছিল। কিন্তু হঠাৎ গ্রামটিতে কলেরা আর গুটিবসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামটিতে অশুভ শক্তি ভর করেছে। এরপরই একে একে সবাই গ্রাম ছাড়তে শুরু করে।

তবে সরকারিভাবে দীর্ঘদিন পরে এই গ্রামে আবারও জনবসতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি গ্রামটিতে মুজিববর্ষের উপহারস্বরূপ ৭টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে ভূমিহীন পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশে। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে একটি কমিউনিটি ক্লিনিকও।

এমনি আরেকটি গ্রাম রয়েছে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার গোহাইল ইউনিয়নের পিচুলগাড়ি নামে। যে গ্রামটি ডাকাতের ভয়ে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে জনমানবশূন্য। সেই গ্রামে এখন শুধু 'ভাঙা কুটিরের সারি'। তবে পুরনো সব বাড়িও আছে। কিন্তু কেউ থাকে না গ্রামটিতে। প্রায় প্রতি রাতে হানা দিত ডাকাত দল। নগদ টাকা থেকে শুরু করে বাড়িতে যা থাকত তাই লুট করে নিয়ে যেত তারা। এ কারণে আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে চলে যান সবাই। পিচুলগাড়ি গ্রামে কেউ না থাকলেও সেখানে রয়ে গেছে এই সব পরিবারের বসতবাড়ি, জমিও।

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই ফিরতে চান বাপ-ঠাকুরদার গ্রামে। কিন্তু বগুড়া থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রামে কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, নেই কোনো আলো। সেখানে এখন যাওয়ার রাস্তা বলতে আলপথ। গ্রামে রাস্তা, বিদ্যুৎ হলেই ফিরে আসবেন বলে জানিয়েছেন তারা। গ্রামটিতে এক সময় ১৬টি বাড়িতে বসবাস করতেন শতাধিক মানুষ। তাদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন। অন্য গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছেন তারা। ■

বিলুপ্ত শত বছরের গ্রাম

মো. আনিসুজ্জামান

এক সময় যে গ্রামে ছিল শিশু-কিশোরদের কোলাহল, মানুষের নানান কাজে ছুটে চলা, ছিল দর্জিবাড়ির সেলাই মেশিনের শব্দ। আজ সেই গ্রামেরা চারপাশ জুড়ে বাঁশঝাড়, নানা প্রজাতির গাছগাছালি আর ফসলের ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা কাঁচা রাস্তা। একটু দূরেই ভারতের বেশ কয়েকটি চা বাগান। সুনসান নীরবতায় এপার-ওপার উড়ে চলা হরেক রকম পাখির কলকাকলি। জনবসতিহীন সবুজ প্রকৃতিতে ঘেরা গ্রামটির নাম চান্দাপাড়া। যেটি গত দুই দশক আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। এ গ্রামটি পঞ্চগড় সদর উপজেলার গরিনাবাড়ি ইউনিয়নের ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষে গড়ে ওঠা।

গ্রামটিতে বংশপরম্পরায় কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করত। বিভিন্ন উৎসবে হতো নানান আয়োজন। গ্রামবাসীরা গ্রামটি ছেড়ে চলে গেলেও কালের সাক্ষী হয়ে আছে পরিত্যক্ত চান্দাপাড়ার শত বছরের পুরানো আধাপাকা জামে মসজিদটি।

গ্রামটি বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হিসেব জানা যায়, সীমান্তে অবস্থিত সবুজ গাছপালা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা গ্রামটি চোর ও ডাকাতদের রোষানলের শিকারে পরিণত হয়। সন্ধ্যা নামতেই গ্রামটিতে হানা দিত তারা। লুটে নিত গ্রামের গরু, মহিষসহ সর্বস্ব। একবার জমি নিয়ে গ্রামবাসীর সংঘর্ষে এক ব্যক্তি মারা যাওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ফলে গ্রামের লোকেরা পাশের গ্রামে ঠাঁই খুঁজে নেয়। চান্দাপাড়া গ্রাম কাগজে কলমে থাকলেও বাস্তবে সেই এলাকায় কোনো জনবসতি নেই। কয়েক বছরের ব্যবধানে এক সময়ের ব্যস্ত সেই চান্দাপাড়া এখন বিরানভূমি। দেখে বোঝার উপায় নেই এক সময় এখানে গ্রাম ছিল। ■

হাওর বেষ্টিত অষ্টগ্রাম

মো. জামাল উদ্দিন

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা হাওর সম্পর্কে অনেকেই জানো, হাওর হচ্ছে জলপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর। এটি অগভীর। বর্ষাকালে চারপাশে যে দিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। আর শীতকালে জেগে উঠে ফসলের মাঠ।

হাওর, নদী আর মিঠাপানির জলাভূমি-প্রকৃতির অপূর্ব সমারোহ রয়েছে হাওর উপজেলা অষ্টগ্রামে। ষড়ঋতুতে অষ্টগ্রামে দেখা মেলে ভিন্ন ভিন্ন অপরূপ সাজ। তাই কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলাকে বলা হয় হাওরের রানি।

চারদিকে শুধু থই থই পানির রাজ্য আর সবুজ শ্যামলিমা। বর্ষার রূপবৈচিত্র্য আর নির্মল প্রকৃতি খুব কাছ থেকে দেখতে যাওয়া যায় এই জেলায়। আর কিশোরগঞ্জের অন্যতম একটি জায়গা হলো অষ্টগ্রাম হাওর। চারদিকে হাওর বেষ্টিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন উপজেলা অষ্টগ্রামের আয়তন ৩৩৫ বর্গকিলোমিটার। জানা যায়- অষ্টগ্রাম, আসিয়া, দুবাই ভাটেরা, নরসিংহ পূর্ববাদ, খাসাল, বীরগাঁও, বত্রিশগাঁও এবং বারেচর এই আটটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হওয়ায় এই জনপদের নাম অষ্টগ্রাম। চারদিক দিয়েই হাওরবেষ্টিত হওয়ায় কিশোরগঞ্জ থেকে অষ্টগ্রাম প্রায় বিচ্ছিন্নই। বর্ষাকালে থই থই পানির বুকে এখানকার গ্রামগুলোকে ছোটো ছোটো দ্বীপ মনে হয়। বর্ষাকালেই এর সৌন্দর্য মূলত ফুটে উঠে।

বর্ষায় উত্তাল বাতাস, মাঝিদের গান, জেলেদের ব্যস্ততা, ছোটো ছোটো নৌকায় মানুষের যাতায়াত, সবকিছু মিলিয়েই চারপাশটা হয়ে উঠে দেখার মতো। এছাড়া অষ্টগ্রামে আছে

৪০০ বছরের ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তি কুতুব শাহ মসজিদ। সুলতানি ও মোঘল স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায় এই মসজিদে। পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের নামকরণ করা হয় দরবেশ কুতুব শাহ্ -এর নাম অনুসারে। মসজিদের পাশেই অবস্থিত দরবেশ কুতুব শাহ্-এর মাজার।

বিদ্যুৎ, মোবাইল নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট সবধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে অষ্টগ্রামে। এখানকার পনির বিখ্যাত। তবে শুধু বর্ষা নয়, যখন পানি নেমে যায় তখন ভিন্ন রূপে এই হাওর জেগে উঠে।

বছরের প্রায় সাত মাস হাওরগুলো পানির নিচে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে পানি শুকিয়ে যায়। রেখে যায় সরু খাল। তখন হাওরের প্রান্তর জুড়ে গজায় ঘাস, যা গবাদি পশুর বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়। হাওরে আসা পানি প্রচুর পলিমাটি ফেলে যায়। এই মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি জেলা নিয়ে হাওরাঞ্চলের অবস্থান। জেলাগুলো হলো-কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হাওর রয়েছে সিলেট বিভাগে। এর মধ্যে হাকালুকি হাওর ও টাঙ্গুয়ার হাওর অন্যতম। হাকালুকি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এর আয়তন ১৮ হাজার ১১৫ হেক্টর। এটি সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। টাঙ্গুয়ার হাওর সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই হাওর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মিঠা পানির জলাভূমি।

সুনামগঞ্জকে প্রকৃতি যেন তার রূপের ঐশ্বর্য ঢেলে আপন মায়ায় সাজিয়েছে। এখানে বর্ষায় থই থই পানিবেষ্টিত হয় সুনামগঞ্জ শহর। হাওরের পানির মাঝে দূরে দূরে জেলার বিভিন্ন উপজেলা, ছোটো-বড়ো গ্রাম, হাট-বাজার। হাওরের পানির মধ্য দিয়ে রাস্তা, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে জলকেলি সব মিলিয়ে অপূর্ব নয়নাভিরাম দৃশ্য যে-কোনো মানুষের হৃদয় কাড়ে। শুকনাকালে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ, সোনালি ফসলের হাসি, হাওরের নিম্নাঞ্চল বিলে, ঝিলে, ডোবা, নালায় মাছ আর মাছ। শীতে হাওরের জলাভূমিতে চেনা-অচেনা পাখিদের কিচিরমিচির। একই স্থানে বছরের দুটি সময়ে দুটি পৃথক রূপ নেয় এমন প্রাকৃতিক ভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ■

বিশ্বের প্রথম ইউটিউব গ্রাম

জিনাত রহমান

কুষ্টিয়ার খোকসা থানার শিমুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামের ২৫/৩০ জন ব্যক্তি স্থানীয় দেলোয়ার মাস্টারের নেতৃত্বে একটি ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করেন। নিজেদের অসাধারণ কার্যক্রমের কারণে গ্রামটি পৃথিবী জুড়ে 'ইউটিউব গ্রাম' নামে পরিচিতি পেয়েছে। বিশেষ এই চ্যানেলটির নাম 'অ্যারাউন্ড মি বিডি'। এখানে ভিডিওর মাধ্যমে গ্রামীণ জীবন বিশেষত রান্না-বান্নাকে তুলে ধরা হচ্ছে বিশ্ব দরবারে। বেশ আয়োজন করে গ্রাম্য ধারায় শত শত মানুষের জন্য রান্না করা হয়। এ রান্নার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াই শৈল্পিকভাবে ভিডিওতে তুলে ধরা হয়। রান্নার এই ভিডিওগুলোতে নেই কোনো উপস্থাপনা, নেই কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সেসব ভিডিও দেশ-বিদেশে ব্যাপক ভাইরাল হয়। এজন্য এ গ্রামটি এখন পৃথিবীর বহু

দেশের মানুষের কাছে 'ইউটিউব গ্রাম' নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাই শিমুলিয়া গ্রামটিকে এখন সবাই 'ইউটিউব গ্রাম' নামে ডাকে। বর্তমানে 'অ্যারাউন্ড মি বিডি'র সাবস্ক্রাইবার ২৩ লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি। আয়োজন করে রান্নার পর গ্রামের শত শত মানুষকে বিনা খরচে সে খাবার খাওয়ানো হয়। ■

চায়না গ্রাম

তাসনিম তুবা

সাভারের তেঁতুলঝোড়ার দক্ষিণ মেইটকা ও ভাকুর্তা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম বর্তমানে 'চায়না গ্রাম' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জীবন-জীবিকা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার উপায় খুঁজতে গিয়ে এই গ্রামের মানুষ শুরু

করে সবজি চাষ। আর এই সবজি চাষে এখানকার কৃষকদের ভাগ্য বদলের সাথে সাথে বদলে গেছে গ্রামের নামও। এই গ্রামগুলোর নাম এখন 'চায়না গ্রাম'। দিন দিন চাহিদা বাড়তে থাকায় এইসব গ্রাম ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা জেলায় জমি ভাড়া নিয়েও অনেকে চাষ করছেন এই সবজি।

বর্তমানে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ও ভাকুর্তা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয় চায়না সবজি নামে পরিচিত ক্যাপসিক্যাম, চায়নাপাতা, লিকপাতা, চাংচিং ওনিয়ন, পিংক বাঁধাকপি, পার্সলি, বেবিকর্ন, সুইটকর্ন, বিট রুট, আইসবার্গ লেটুস, চেরি টমেটো, ব্রকোলি, লেমন গ্রাস, থাই জিনজারসহ প্রায় ২০ থেকে ২২ জাতের বিদেশি সবজি। বিদেশি সবজির পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন রকম দেশি সবজিও চাষ করছেন কৃষকরা। সেইসঙ্গে অনেক দিনমজুর শ্রমিকের কর্মসংস্থানও হয়েছে এইসব গ্রামে। চায়না সবজি যেন এ গ্রামের আশীর্বাদ। ■

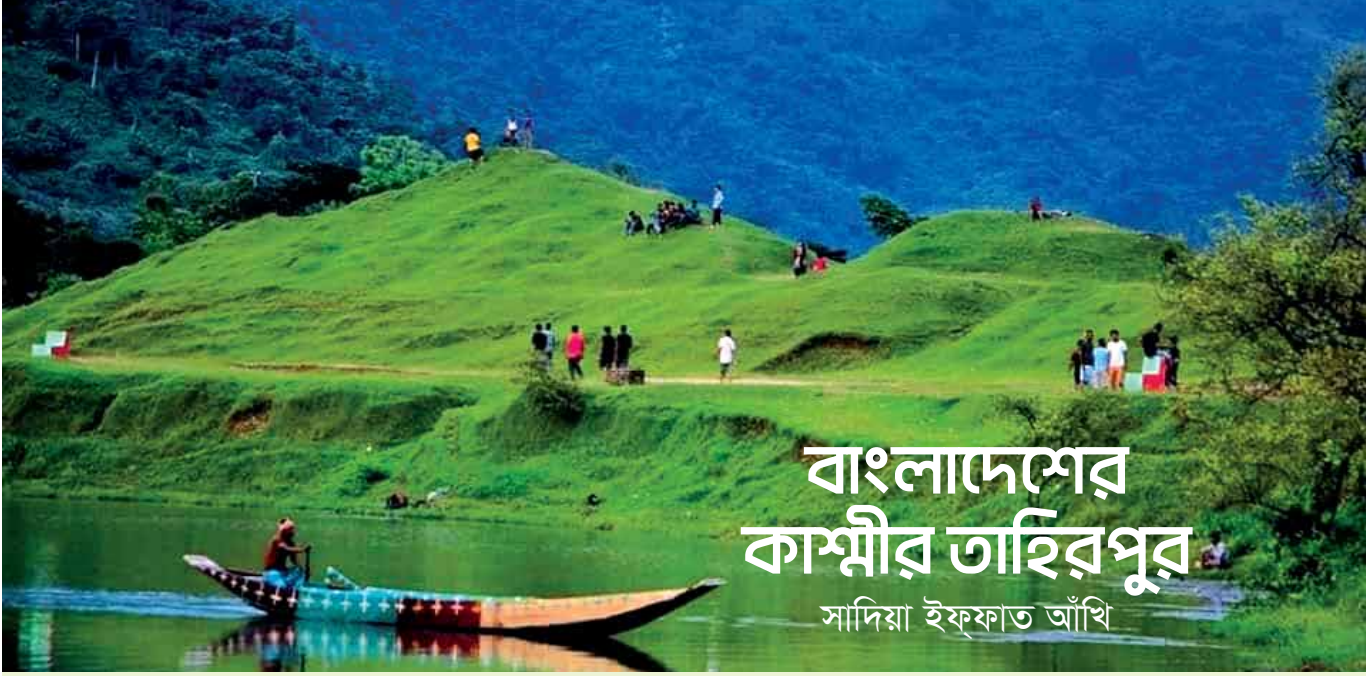

বাংলাদেশের কাশ্মীর তাহিরপুর

সাদিয়া ইফফাত আঁখি

গ্রাম, পাহাড়, বন, ঝরনা, লেক, হাওর ও নদীবেষ্টিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুনামগঞ্জের তাহিরপুর। ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণ করে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। 'তাহির' শব্দের অর্থ পবিত্র এবং 'পুর' শব্দের অর্থ নগর অর্থাৎ তাহিরপুর মানে পবিত্র নগর।

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের কোলঘেঁষা সীমান্ত জনপদ তাহিরপুর মূলত হাওর অঞ্চল। তাহিরপুরকে বলা হয় সুনামগঞ্জ জেলার প্রাণকেন্দ্র। এ যেন বাংলাদেশের স্বর্গস্থান। তাহিরপুরের রূপের কথা আজ তোমাদের জানাবো।

শিমুল বাগান: তাহিরপুরের মানিকগাঁও গ্রামে রয়েছে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড়ো শিমুল বাগান। প্রায় ১০০ বিঘার বেশি জায়গা জুড়ে ২০০২ সালে প্রায় ৩ হাজার শিমুল গাছ রোপণ করা হয়। বসন্তের লাল শিমুলের রক্তলাল পাপড়ির সৌন্দর্য উপভোগ করতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে।

টাঙ্গুয়ার হাওর: তাহিরপুরে রয়েছে এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রামসার সাইট ওয়ার্ল্ড হেরিটেজখ্যাত বিশাল জলরাশির টাঙ্গুয়ার হাওর। টাঙ্গুয়ার স্বচ্ছ নীলাভ জল যে কাউকে নিয়ে যায় ভিন্ন এক জগতে। শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে অতিথি পাখি। প্রায় ১০০ কি. মি. আয়তনের এই হাওর পাড়ে রয়েছে ৮৮টি গ্রাম। এসব গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা এই হাওরের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের কাশ্মীর: বাংলার কাশ্মীর হিসেবে সুপরিচিত তাহিরপুরের নীলাদ্রি লেক বা শহীদ সিরাজ লেক। স্থানটি চুনাপাথরের পরিত্যক্ত খনির লাইমস্টোন লেক। উপজেলার উত্তর শ্রীপুর ইউনিয়নের টেকেরঘাট গ্রামে লেকটি অবস্থিত। লেকের নীল পানি, ছোটো-বড়ো টিলা এবং পাহাড়ের সমন্বয় নীলাদ্রি লেককে করেছে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। এ যেন বাংলাদেশের এক টুকরো কাশ্মীর।

বারেকটিলা: তাহিরপুরের আরেকটি দর্শনীয় স্থান হলো বারেকটিলা। যা স্থানীয়দের কাছে 'বাড়িক্কা টিলা' নামে পরিচিত। একে বাংলার আইফেল টাওয়ারও বলে অনেকে। এ টিলার তলদেশ দিয়ে বয়ে গেছে জাদুকাটা নদীর স্বচ্ছ পানি।

জাদুকাটা নদী: স্বচ্ছ নীলাভ পানির জাদুকাটা নদী ভারতের খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড়ে উৎপত্তি। নদী থেকে বালু ও নুড়ি পাথর উত্তোলন করে তাহিরপুর ও পাশের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার অধিকাংশ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। নদীর স্বচ্ছ পানির নিচে চিকচিক করে সাদা নুড়ি।

লাল শাপলার গ্রাম: তাহিরপুরের একটি গ্রামে রয়েছে শাপলা ফুলের হাওর। উত্তর বড়দল ইউনিয়নের কাশতাল গ্রামের বিকিবিল হাওরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জায়গা নিয়ে ফোটে শাপলা ফুলের বাহার। স্থানীয়রা যাকে লাল শাপলার গ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছে। শত শত হাজারো লাল শাপলা ফুটে রক্তিম আভার সৃষ্টি করে। ■

সবচেয়ে বড়ো গ্রাম

শাহানা আফরোজ

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো গ্রাম বানিয়াচং শুধু বাংলাদেশ নয় সরকারি তথ্যমতে পুরো এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম গ্রাম। সাধারণত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত। অথচ বানিয়াচং গঠিত হয়েছে চারটি ইউনিয়ন নিয়ে। এই একটি গ্রামের ২৭টি পাড়ামহল্লা রয়েছে। হাওরাঞ্চলের এই গ্রামে প্রায় সোয়া লাখ মানুষ বসবাস করে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক থেকেও গ্রামটি সুপ্রাচীন। আজ থেকে প্রায় বারো'শ বছর পূর্বে বানিয়াচং রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এককালে বানিয়াচং ছিল তৎকালীন লাউড় রাজ্যের রাজধানী। পল্লিরাজ বা মহাগ্রাম বানিয়াচং হবিগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় আঠারো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং কিশোরগঞ্জ সীমান্ত থেকে বারো কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। উত্তরে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই, শাল্লা ও হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ। দক্ষিণে হবিগঞ্জ সদর ও দক্ষিণ-পশ্চিমে লাখাই, পূর্বে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ ও বাহুবল ও পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা ও মিটামইন উপজেলা। বানিয়াচং গ্রামের দু'পাশে খাল, বিল ও হাওরে পরিবেষ্টিত।

সবচেয়ে ছোটো গ্রাম

গ্রামের আয়তন মাত্র ৬০ শতক। লোকসংখ্যা মোট চারজন, যারা সবাই একই পরিবারের সদস্য। এর মধ্যে পরিবারের একমাত্র পুরুষ সদস্য দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে। বাকি তিন জনের মধ্যে দুজন নারী ও একজন শিশু। সবশেষ ভোটার তালিকায় এই গ্রামে ভোটার আছেন দুজন।

চারপাশে ধানি জমি। কোনো রাস্তা নেই। ক্ষেতের আলপথ ধরে বাঁশবাগান পেরিয়ে সামনে গেলেই দেখা মেলে একটি বাড়ির। এই বাড়ি নিয়েই গড়ে উঠেছে একটি গ্রাম। নাম শ্রীমুখ। সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার খাজাঞ্চি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে অবস্থান এই গ্রামের। সিলেটের একেবারে পশ্চিমের উপজেলা বিশ্বনাথ। তেলিকোনা ও পশ্চিম নোয়াগাও নামে দুটি গ্রামের মাঝখানে অবস্থান শ্রীমুখের। পরিসংখ্যান ব্যুরোর নথি ও ভোটার তালিকাতেও রয়েছে একটি পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠা এই গ্রামের নাম। শ্রীমুখ দেশের তো বটেই, এমনকি বিশ্বের 'সবচেয়ে ছোটো গ্রাম' বলে দাবি করছেন গবেষকেরা। একটি মৌজা নিয়েই শ্রীমুখ গ্রাম। দাগ, খতিয়ান এবং মৌজাসহ সরকারি সব নথিপত্রে শ্রীমুখ আলাদা গ্রাম হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। ■

আদর্শ গ্রাম

ফারহানা চৌধুরী

আঁকাবাঁকা মেঠোপথ, দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত আর সবুজের সমারোহ-সব মিলিয়ে মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য। আবহমান গ্রামবাংলার চিরায়ত রূপ তো এমনই হয়! তবে গ্রামটির শত বছরের বিবর্তনের কাহিনি সত্যিই চমকে যাওয়ার মতো।

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে গত ৫০ বছরে কোনো মামলা-মোকদ্দমার জন্য পুলিশ আসেনি এখানে। নেই রাজনৈতিক বিভাজন, হানাহানি। শুধু তা-ই নয়, গ্রামের মানুষজনও শতভাগ শিক্ষিত। গ্রামটি বাল্যবিবাহ, মাদক ও যৌতুকমুক্ত। সুখে-দুঃখে একে-অন্যের পাশে থাকে সবাই। নাটোরের সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নে অবস্থিত বিস্ময়কর গ্রাম হুলহুলিয়া। জেলা সদর থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে ১৩টি পাড়া নিয়ে গঠিত চলনবিলবেষ্টিত গ্রামটির আয়তন প্রায় দুই বর্গকিলোমিটার। গ্রামে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে বিশাল একটি গেট। যেখানে লেখা রয়েছে, 'আদর্শ গ্রাম হুলহুলিয়া'। এখানে শিক্ষার পাশাপাশি স্যানিটেশন ব্যবস্থাও প্রায় শতভাগ। শীতে এ গ্রামে ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি পাখি আসে। কিন্তু গ্রামের কারোরই পাখি মারার স্বভাব নেই। গ্রামটিতে আছে নানা পেশার মানুষ ও প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। আদর্শ গ্রাম হিসেবে পরিচিতি লাভের পেছনে বড়ো ভূমিকা রেখেছে হুলহুলিয়া সামাজিক উন্নয়ন পরিষদ।

১৯৪০ সালে 'হুলহুলিয়া সামাজিক উন্নয়ন পরিষদ' গঠন করে গ্রামবাসী। এ পরিষদের মাধ্যমে গ্রামের 'শাসন ব্যবস্থা' পরিচালিত হয়। ২৩ সদস্যের পরিষদে আছেন পাঁচজন উপদেষ্টাও। দুই বছর পরপর গ্রামবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটেই সদস্যরা নির্বাচিত হন। গ্রামে কোনো বিরোধ হলে এই পরিষদই আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে দেয়। বড়ো অপরাধ নেই, তাই দরকার হয়নি থানায় যাওয়ারও।

১৯৬৬ সালে প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। শিক্ষকদের অনেকেই বিনা বেতনে শিক্ষাদান করেন। এরপর হয় মাদ্রাসাও। বর্তমানে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি দুটি বিদ্যালয়ও আছে। ১৯৪৪ সালে 'দ্য হুলহুলিয়া ডায়মন্ড ক্লাব' গঠন করা হয়। যেখানে কাজ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামের রয়েছে শেকড় ও বটবৃক্ষ নামের সংগঠন। ৩৫ বিঘা জমির ওপর একটি স্থায়ী কবরস্থানও রয়েছে গ্রামটিতে। ■

এক গ্রামে ৩৬৫টি পুকুর

মো. আদনান শাহরিয়ার

গ্রামের নাম চক-চান্দিরা। নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার ইসবপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। এ গ্রামেই আছে ৩৬৫টি পুকুর। ছোটো-বড়ো এই পুকুরগুলো প্রায় আট কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আছে। গ্রামে প্রবেশপথে দেখা মিলবে রাস্তার দু'ধারে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, মাটির ও আধাপাকা বসতবাড়ি। এ গ্রামে বাড়ি আছে ৩৫০টি আর পুকুর আছে ৩৬৫টি। পুকুরগুলো পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। আবার কিছু পুকুর চার কোনাকৃতি। পুকুর পাড়ে রয়েছে সবুজ বনায়নও।

এই পুকুরগুলো তৈরির পিছনে রয়েছে লোককথা অষ্টম শতাব্দীর পাল বংশের রাজা চান্দিলাল পালের স্ত্রী হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। আরোগ্য লাভে রাজদরবারে হেকিম, কবিরাজ ও বৈদ্যদের নিয়ে সভা

হয়। হেকিমরা রাজাকে স্ত্রীর রোগ থেকে মুক্তি লাভে ৩৬৫টি পুকুর খনন করার পরামর্শ দেন। রানী প্রতিদিন আলাদা আলাদা পুকুরে গোসল করবেন। এতে রানি রোগ থেকে মুক্তি পাবেন। হেকিমদের পরামর্শে রাজা পুকুরগুলো খনন করেন। আর প্রতিটি পুকুরে তিন-চারটি সান বাঁধানো ঘাট তৈরি করেন।

বাংলাদেশের কোথাও একই গ্রামে এতগুলো পুকুর নেই। প্রতিদিন পুকুরগুলো দেখতে মানুষ এখানে ছুটে আসেন। পুকুর পাড়ে গাছের ছায়ায় বসে আনন্দে সময় কাটান। এখানে রয়েছে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে এবং আকর্ষণীয় করতে এরই মধ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। ■

মাটির বাড়ি বেষ্টিত গ্রাম

মাহমুদ হাসান

গ্রামের নাম ধানজুড়ি। নাম শুনেই হয়ত চোখের সামনে ভেসে উঠবে দিগন্তজোড়া ধানের মাঠ। আদতে গ্রামটিতে গেলে মাটির ঘরই সবচেয়ে বেশি নজর কাড়বে। এ গ্রামের বিশেষত্ব এটি। ধানজুড়ির অবস্থান দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নে। এটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সাঁওতাল অধ্যুষিত একটি গ্রাম।

গ্রামটিতে রয়েছে ১১৫টি বসতঘর, অধিকাংশই মাটির বাড়ি। প্রতিটি বাড়ি বিভিন্ন ধরনের আলপনা দিয়ে সুসজ্জিত। সেইসঙ্গে পুরো গ্রামটিই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম ও সুন্দর করে সাজানো। সাঁওতাল জনগোষ্ঠির ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই এ মাটির বাড়ি নির্মাণ করে ওই ঘরে পরিজন নিয়ে বসবাস করে আসছে। এই মাটির বাড়িগুলোতে যেমন আদ্রতা থাকে, তেমনি বাড়ি তৈরিতে খরচও কম হয়। সড়কের দুই পাশে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তারা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। এখানকার প্রত্যেকটি বাড়িরই আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ গ্রামের মেয়েরা ছোটোবেলা থেকেই মাটির বাড়ির কাজ শিখে। প্রতিটি মাটির বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের আলপনা তৈরি করে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। ■

নারী ফুটবলারদের গ্রাম

ফাতেমা জেসমিন রিমা

নারীদের সফলতায় গর্বিত এক গ্রাম। রংপুর শহরের ১৫ কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার সদ্যপুষ্করনি ইউনিয়নের পালিচড়া গ্রাম। এই গ্রামের নারীরা ফুটবল খেলে দেশে-বিদেশে। বিদেশের মাটিতে শিরোপা জয়ের সাফল্যও আছে তাদের। সেই সুবাদে পালিচড়া গ্রাম এখন 'নারী ফুটবলারদের গ্রাম' হিসেবে পরিচিত। এই গ্রামের নারী খেলোয়াড়দের দল 'সদ্যপুষ্করনি যুব স্পোর্টিং ক্লাব'- ভারতের পশ্চিমবঙ্গে শিরোপা জিতে আলোচনায় এসেছে।

২০১৩ সালে এই ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়। ২০১৫ সালে ক্লাবটি সরকারিভাবে নিবন্ধন পায়। মেয়েরা বাংলাদেশ নারী জাতীয় দলের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছেন বয়সভিত্তিক দল ও ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে। এবার তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্লাবভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে শিরোপা জিতেছে। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া একমাত্র দল তারা। ভুটানের একটি ক্লাব ছিল। বাকি ছয়টি ক্লাব পশ্চিমবঙ্গের। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া নারী খেলোয়াড়দের বয়স ১৩ থেকে ১৭ বছর। ফুটবলে মেয়েদের ধারাবাহিক সফলতার জন্য পালিচড়া এম এন উচ্চ বিদ্যালয় ও মজিদা খাতুন কলেজের মাঠে নির্মিত হয়েছে একটি মিনি স্টেডিয়াম। যেখানে প্রতিদিন মেয়েরা ফুটবল অনুশীলন করে। মেয়েদের কারণেই এই গ্রামকে এখন সবাই 'নারী ফুটবলারদের গ্রাম' বলে থাকে। ■

গোলাপ গ্রাম

বশিরুল আলম

ফুল ভালোবাসে না এমন মানুষ পৃথিবীতে খুব কম পাওয়া যাবে। তাই ফুলের প্রতি এই ভালোবাসার টানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ফুলপ্রেমীরা ছুটে আসেন সাভারের গোলাপ গ্রামে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব বয়সের ফুলপ্রেমীরা বাগানে প্রবেশ করে হারিয়ে যান গোলাপের রাজ্যে। সারাদিন ঘুরে নিজেদের সাজিয়ে তুলেন সাদা, গোলাপি, লাল, নীল ও হলুদসহ নানা রঙের বাহারি ফুল দিয়ে।

সাভার উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়নটি বর্তমানে 'গোলাপ গ্রাম নামে খ্যাত। এই ইউনিয়নের বাগ্নীবাড়ী, মইস্তাপাড়া, কাকাব, সামাইর, সাদুল্ল্যাপুর, শ্যামপুর, আকরান নামের বেশ কয়েটি গ্রামে প্রায় ৩শ' হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে গোলাপ ফুলের চাষ করা হয়।

গ্রামের বুক চিরে চলে গেছে আঁকাবাঁকা সরু পথ। তার দুই পাশে বিস্তীর্ণ এই গোলাপের বাগান। যেদিকে চোখ যায় শুধু গোলাপ আর গোলাপ। ফুলের সুবাস ও মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দিয়েই গোলাপ বিরুলিয়া ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের নাম পালটে দিয়েছে। ■

গহনা ও শাকপাতার গ্রাম

নামিরা রহমান অর্থি

রাজধানীর অদূরে সাভারের ভাকুর্তা গ্রাম। ওই গ্রামকে এখন সবাই গহনার গ্রাম নামেই চিনে। তবে ঐ গ্রামের গল্পটা বেশ পুরনো। সেখানকার কারিগররা প্রায় ৩০০ বছর ধরে বংশপরম্পরায় গহনা তৈরির পেশায় যুক্ত। ১৯৯০ সালের দিকে স্বর্ণের দাম বাড়ায় সেই জায়গাটা দখল করে নেয় রূপার গহনা। রূপার দামও বেড়ে গেলে লোকসানে পড়েন কারিগররা। এরপর তারা তৈরি করতে শুরু করেন পিতল ও তামার গহনা। যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনাল পার হলেই আমিন বাজারের পথ। সেই পথ ধরে এগুলেই হাতের বাম দিকে পুরাতন বেইলি ব্রিজ। সেই ব্রিজ পার হলেই ভাকুর্তা গ্রাম। সবুজে ঘেরা এই গ্রাম ঘিরে গড়ে উঠেছে 'গহনাশিল্প'। এই গ্রামের গহনাশিল্পীরা তাদের বাপ-দাদার পেশাকেই ধরে রেখেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ভাকুর্তা বাজারে ঢুকতেই চোখে পড়বে সারি সারি গহনার কারখানা। গ্রামের প্রতিটা ঘরে ও দোকানে কারিগররা এক মনে বানিয়ে যাচ্ছেন নানা নকশার গহনা। সেগুলোতে আবার বিভিন্ন ধরনের রঙিন পাথর ও পুঁতি বসিয়ে ডিজাইন ফুটিয়ে তোলার কাজ করেন নারী ও পুরুষ শিল্পীরা। সেখান থেকে গয়না সরবরাহ হয় দেশের সব বিপণিবিতানে।

গহনার পাশাপাশি শাকপাতার গ্রাম হিসেবেও ভার্কুতা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেখানকার গ্রামগুলোতে সারা বছর চাষ হয় শাকসবজি। সবুজ আর লালশাকের মাঠ দেখলে মনে হবে বাংলাদেশের পতাকার রংয়ে রাঙানো গ্রাম। মৌসুম ভেদে পাটশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, মূলাশাক, পুঁইশাক, লাউশাক, সরিষা আর আলুশাক অন্যতম। শাক চাষের পাশাপাশি এখানকার চাষিরা বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি সবজি, যেমন- লাউ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপিসহ থাইপাতা, কারিপাতা আর ব্রকোলির চাষও করেন। সেজন্য পুরো ভাকুর্তা ইউনিয়নকে বলা যায় শাকপাতার গ্রাম। ■

চারদিকের গ্রাম

সানাউল হক

সর্ব পূর্বের গ্রাম: থানচি বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। তিন্দু থানচি উপজেলার সবচেয়ে বড়ো একটি ইউনিয়ন। তিন্দুর একটি পাড়া/ গ্রাম আখাইনঠ্যং, যা সর্ব পূর্বের গ্রাম। এ ইউনিয়নের উত্তরে থানচি সদর ইউনিয়ন, পশ্চিমে আলীকদম উপজেলার আলীকদম সদর ইউনিয়ন, দক্ষিণে রেমাক্রী ইউনিয়ন এবং পূর্বে মিয়ানমারের চিন প্রদেশ অবস্থিত। তিন্দু ইউনিয়ন থানচি উপজেলার আওতাধীন ২নং ইউনিয়ন পরিষদ।

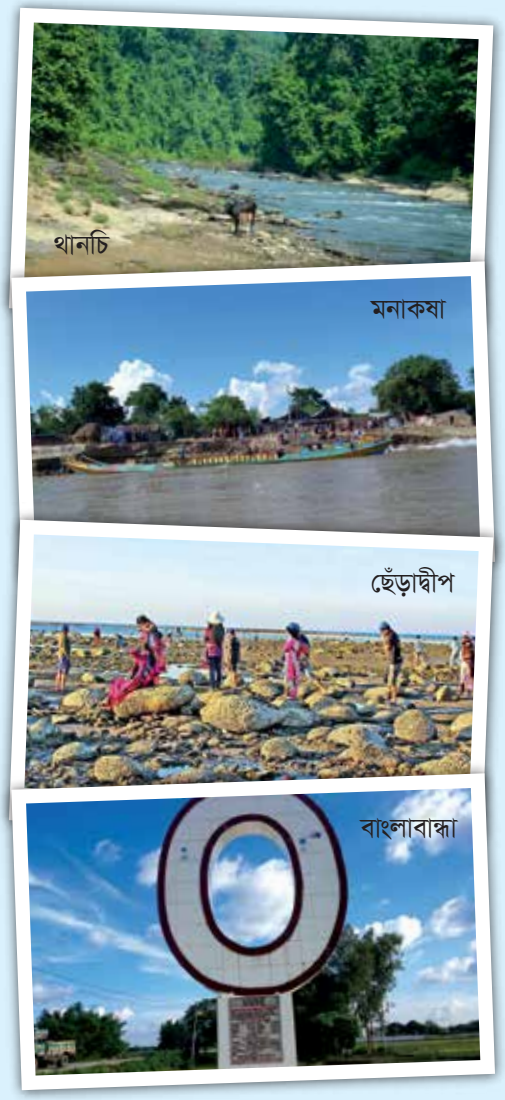

সর্ব পশ্চিমের গ্রাম: মনাকষা রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার একটি ইউনিয়ন। সেই ইউনিয়নের একটি গ্রাম মনাকষা। এটি বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমের গ্রাম। মনাকষা ইউনিয়ন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার, শিবগঞ্জ উপজেলার ৭ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এ ইউনিয়নের উত্তরে বিনোদপুর, দক্ষিণে দূর্লভপুর ইউনিয়ন, পূর্বে শ্যামপুর ইউনিয়ন, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। ডাকঘর মনাকষা-৬৩৪২। মনাকষা ইউনিয়ন পরিষদ ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্ব দক্ষিণের গ্রাম: ছেঁড়াদ্বীপ হলো বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিণের সর্বশেষ বিন্দু। এরপরে বাংলাদেশের আর কোনো ভূখণ্ড নেই। সেন্ট মার্টিন থেকে বিচ্ছিন্ন ১০০ থেকে ৫০০ বর্গমিটার আয়তনবিশিষ্ট কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে, যেগুলোকে স্থানীয়ভাবে 'ছেঁড়াদিয়া' বা 'সিরাদিয়া' বলা হয়ে থাকে। সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন থেকে ছেঁড়াদ্বীপ প্রায় ৮ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এ দ্বীপে মানুষ বসবাস করেন না। তবে জেলেরা দিনের বেলা মাছ ধরে রাতে নিজ নিজ ঘরে ফিরে। তাই ছেঁড়াদ্বীপকে গ্রাম না বললেও সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে আছে দক্ষিণপাড়া গ্রাম। যাকে সর্ব দক্ষিণের গ্রামও বলা যায়।

সবচেয়ে উত্তরের গ্রাম: বাংলাবান্ধা বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের পঞ্চগড় জেলার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া উপজেলার একটি ইউনিয়ন। এটি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের ইউনিয়ন। আর এ ইউনিয়নের সর্ব উত্তরের গ্রাম জায়গীরজোত। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থলবন্দরটিও এখানে অবস্থিত। ত্রিভুজাকৃতির এ ইউনিয়নের দক্ষিণে তিরনইহাট ইউনিয়ন, পূর্বে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা এবং পশ্চিমে মহানন্দা নদীর ওপাড়ে ভারতের দার্জিলিং জেলা অবস্থিত। ■

রূপে ভরা জলের গ্রাম

সারাহ জেরিন

বর্ষায় মুগ্ধতা ছড়ায় শাপলা-শালুক। আর শীতে সবুজের রাজ্যে পাখিদের নিরাপদ শান্তির নীড়। বর্ষায় যাতায়াতের প্রধান ভরসা নৌকা। শীত মৌসুমে পথ চলতে হয় পায়ে হেঁটে। নামে- রূপে গ্রামখানি প্রশান্তির স্থান।এমনই একটি রূপে ভরা 'জলের গ্রাম' অন্তেহরি। মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে কাওয়াদিঘি হাওরের পাশেই গ্রামটি। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এ অন্তেহরি গ্রামকে ২০১৮ সালে পর্যটন এলাকা ঘোষণা করে নামকরণ করা হয় 'জলের গ্রাম অন্তেহরি'।

ভেসে থাকা এই গ্রাম 'সোয়াম ভিলেজ অন্তেহরি' নামে পর্যটকদের কাছে পরিচিতি। বর্ষায় গ্রামের বাড়িগুলো দেখে মনে হয় একটি বাড়ি একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ির যাতায়াতের মাধ্যম শুধুই নৌকা। প্রতিটি বাড়ির বাঁকে-বাঁকে থেকে মাছ শিকারের নানা আয়োজন। আবার শীতে এক একটি বাড়ি মনে হবে টিলার ওপর তৈরি। হাওরের বাড়িঘর খুব সহজে পানিতে নিমজ্জিত হয়। এ কারণে বাড়িগুলো অনেক উঁচুতে নির্মাণ করতে হয়। প্রতিটি বাড়ির চারিদিকে দেখা মিলবে বিভিন্ন জাতের গাছগাছালি। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিজল, তমাল, করচ এই গাছগুলো বর্ষায় হাওরের ঢেউ থেকে বাড়িগুলোকে রক্ষা করে এবং সারা বছর দেশীয় পাখিদের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল। গ্রামের কেউ পাখি শিকার করে না।

বর্ষায় হাওরের বুকে থাকে থইথই জল কিংবা জলের ওপর এক টুকরো সবুজের হাতছানি। শাপলা ও শালুক অথবা নাম না জানা বাহারি ফুল যেন জানান দেয়, স্বাগতম হে অতিথি জলের গ্রামে। সবুজ গালিচা বিছানো মাঠে সাদা বক উড়ে বেড়ায় খাদ্যের সন্ধানে। নানা জাতের পাখিগুলো সন্ধ্যা নামার মুহূর্তে গ্রামের গাছগুলোতে এসে আশ্রয় নেয়। আর তখনই অন্তেহরি ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ালে এই জলের গ্রামের নান্দনিক রূপ নিয়ে যাবে কল্পনার রাজ্যে। ■

দেশের প্রথম ডিজিটাল গ্রাম

আবু আহাদ

কক্সবাজারের তুলাতুলী। উখিয়ার রত্নাপালং ইউনিয়নের মিয়ানমার সীমান্তবর্তী গ্রাম । ডিজিটাল সুবিধায় বদলে গেছে জনজীবন। মিয়ানমার সীমান্তবর্তী দুর্গম এই অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষক থেকে শুরু করে সবাই পাচ্ছেন ডিজিটাল সুবিধা।

এখানে স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল ভিলেজ সেন্টার। এই সেন্টারের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষিদের কৃষিপণ্য বেচাবিক্রি, অনলাইনে কৃষিবিষয়ক তথ্য প্রদানসহ পণ্যের বাজার দর ও বাজারজাতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। কৃষিপণ্য বিক্রি করে একদিকে যেমন লাভবান হচ্ছেন তারা, অন্যদিকে বেঁচে যাচ্ছে সময়।

তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইনে জন্মনিবন্ধন থেকে শুরু করে জমির খতিয়ান, ক্ষেত-খামারের পরিচর্যা, রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনসহ দেওয়া হয় নানা সেবা। এই কেন্দ্র স্থাপনে জমি দেওয়াসহ সহযোগিতা করেছেন গ্রামের মানুষ। তুলাতুলী তথ্যসেবা কেন্দ্রের জমিদাতা নুরুল আলম জানান, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আছে ঘরে বসে সবকিছু করার, সেজন্য এখানে জায়গা দিয়েছি আমি। এখানে মূলত দুই ধরনের সেবা দেওয়া হয়। একটা হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক সেবা, অন্যটি কৃষিভিত্তিক সেবা। সেই সেবাগুলো আমরা নিজেরাই দিয়ে থাকি। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কী অথবা কোনো একটা ফসলে যদি রোগ হয় তাহলে সেটার সমাধান কী হবে এই ডিজিটাল সেন্টারে তার পরামর্শ পাওয়া যায়।' এসবের ধারাবাহিকতায় তুলাতুলীকে ডিজিটাল গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে।■

নার্সারি গ্রাম

নুসরাত কিন্তি

অপরূপ সবুজ, বাহারি রঙের ফুল। অসংখ্য ফলদ ও বনজ চারা। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজের সমারোহ। নেই কোনো খালি জায়গা। নতুন নতুন মানুষ যোগ দিচ্ছে এই সবুজ উদ্যোগে। বন্ধুরা, তোমাদের বলছি নার্সারি গ্রামের কথা। নাম তার গদাইপুর। এটি খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় অবস্থিত। যাকে সবাই ডাকে নার্সারি গ্রাম বলে।

ভোর হতেই কেউ চারা তুলছেন, কেউ কলম তৈরি করছেন, কারও ব্যস্ততা চারা পরিচর্যায়, কেউ গাছ তুলে দিচ্ছেন ভ্যানে। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এখানে আসছেন ফুল, ফল ও বনজ চারা কিনতে। ২০০২ সালে গদাইপুর গ্রামে স্বল্প পরিসরে নার্সারির শুরু। ২০১০ সালে বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন হয়। ব্যাবসা লাভজনক হওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে উপজেলার ২০টি গ্রামে। তবে গদাইপুর গ্রামেই সবচেয়ে বেশি নার্সারি। এসব নার্সারিতে আম, কুল, সফেদা, আমড়া, শরিফা, লিচু, মাল্টা, কতবেল, আঙুর, আপেল, ড্রাগন, মেহগনি, চাম্বল, গোলাপ, জবা, রজনীগন্ধা, কাঠগোলাপ চারা উৎপাদন হচ্ছে। এখান থেকে ভারতেও রপ্তানি হচ্ছে উন্নত জাতের কুল, নারিকেল, সফেদা, আমড়া, লিচু ও পেয়ারা প্রভৃতি চারা গাছ।

এই উপজেলার প্রায় পাঁচ শতাধিক নার্সারি রয়েছে। সমিতির সদস্য ৪৩৯ নার্সারি মালিক। ১৫-২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। একেকটি নার্সারি ৫ কাঠা থেকে শুরু করে ২০-৩০ বিঘা পর্যন্ত জমিতে নার্সারি গড়ে উঠেছে। বছরে ১৫ কোটি টাকার বেশি মূল্যের চারা উৎপাদন ও বিক্রি হয়। নার্সারিতে নিয়োজিত কৃষকদের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও জৈব সারসহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। ■

জয় বাংলা

রওশন-ই আলম

নদীর পারে বাড়ি আমার
গাছের নিচে ঘর
রোদ ছায়ার খেলা সেথায়
সারা দিন ভর।
পাখি ডাকে বাতাস বয়
নাচে ফিঙের দল
সামনে খোলা মাঠের মাঝে
ফড়িং আর উৎপল।
মাঠ ছাড়িয়ে ওপার গাঁয়ে
টোনা মনার বাড়ি
শাওন এলে নৌকা বেয়ে
ধরতে হয় পাড়ি।
কার্তিক মাসে মৌ মৌ করে
নতুন ধানের ঘ্রাণ
শীতের ছোঁয়ায় শিশির কণা
বেহুঁশ করে প্রাণ।
খালের জলে বিলের বুকে
ভাসে বেড়ানি ডিঙা
হিজল তলে মালা সাজায়
রঙিন মাছরাঙা।
অগ্রহায়ণে গোলা ভরে
পালুই হয় ঠাসা
মায়ের চোখে ভেসে বেড়ায়
ছিন্ন ভিন্ন আশা।
ফাগুন এলে গাছের ডালে
লাল শিমুলের খেলা
পাশের গাঁয়ে বটের মূলে
জমে ওঠে মেলা।
গহিন রাতে বাঁশের ঝাড়ে
জোনাক জ্বালায় আলো
এমন দেশেই জন্ম আমার
নেই যেখানে কালো।

একাদশ শ্রেণি,
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

আমার গ্রাম এখন স্বাধীন

বশিরুজ্জামান বশির

আজ হোক কাল হোক তোমাকে
আমার গ্রাম দেখাবো
আমার স্বজনদের সঙ্গে নতুনভাবে
পরিচয় হবে তোমার।
তুমি কোনো কিছু ভাববে না
তোমার কোনো ভয় নেই।
আমার দেশ এখন স্বাধীন
আমার গ্রামও এখন স্বাধীন
আমার স্বাধীন গ্রামে তুমি
অবশ্যই মাথা উঁচু করে কথা বলবে।

স্মৃতিময় দিন

মো. তাসিন হোসেন

গ্রামের স্মৃতিময় দিনগুলো
কেটে গেল কখন
কত্ত মজা করতাম
বন্ধুরা মিলে যখন-তখন।

আম জাম নিয়ে
হত যে কত কাড়াকাড়ি
এসব নিয়ে সারাদিন কেটে
সন্ধ্যায় ফিরতাম বাড়ি।

মায়ের বকুনি খেয়ে
পড়তাম যে ঘুমিয়ে
সকাল হতেই আবার
পাড়া রাখতাম মাতিয়ে।

একাদশ শ্রেণি
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প

গোয়েন্দা কাঠিখান ও হারানো গরু

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

কাঁথাখানা বুকের ওপর জড়িয়ে টাবুকা বলল, 'ওখানে তালগাছটার পাশে আরেকটা তালগাছ দাঁড়িয়ে ছিল , ওটা কী বলো তো?'

এতক্ষণে ঠাওর হলো। সত্যিই তো তাই! দুপুরে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে আমি আর টাবুকা পুকুরের ওই পাড়ে গিয়েছিলাম কদম ফুল তুলতে। গতরাত থেকে টানা বৃষ্টি, আকাশ ঘন মেঘে ছাওয়া, বৃষ্টিতে দরদর করে ভিজতে থাকা বাগানের ভেতরটায় ছিল কালো অন্ধকার। তখনই ভেতরের দিকে তালগাছটার পাশে একটা ভেজা শিমুলগাছের গা ঘেঁষে আরেকটি তালগাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তখন কিচ্ছুটি মনে হয়নি। আজীবন তো ওই বাগানে একটাই তালগাছ দেখে আসছি।

কী উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছি না, টাবুকা বলল, 'ওটা ভূতের পা!'

শুনেই গা-টা শিউরে উঠল। টাবুকার দিকে সরে গিয়ে কাঁথায় নিজেকে মুড়ে নিলাম। দিনভর বৃষ্টিতে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে কখন যে দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে বোঝার উপায় নেই। দুপুর থেকে পুকুরের দিকের এই ঘরে কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে আছি দুজনে। মাথার কাছে জানালাটা খোলা। ওই জানালা দিয়ে তাকালেই পুকুরের ওই পাড়টা দেখা যায়। বৃষ্টির একটানা ঝুপঝুপ ঝমঝম শব্দ, ব্যাঙের ডাক আর ভেজা অন্ধকার মিশে বাড়ির চারপাশটা সেকেলে মাঠ-জঙ্গলের মতো লাগছে। জানালাটা বন্ধ করলে ভালো হতো, এই যখন ভাবছি-দমকা হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে তা গুলিয়ে দিলো।

টাবুকার কথাটা মানতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মুখে তা স্বীকার করলাম না। বললাম, 'ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।'
'বিশ্বাস না হওয়ার তো উপায় নেই, স্বচক্ষেই তো দেখলি!'
তাও তো ঠিক। এবার ভয়ে একেবারে সেঁধিয়ে গেলাম।
টাবুকা বলল, 'এর একটা বিহিত করতে পারে গোয়েন্দা কাঠিখান, তাকে একবার বলা যেতে পারে।'

প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হলো। পাশের বাড়িতে একজন গোয়েন্দা এসেছে। একেবারে সরু কালো একটা কাঠির মতো দেখতে। তাই আমরা তাকে কাঠিখান বলে ডাকি। আসল নাম জানা হয়নি। কাজের ফাঁকে দু-একবার ওই নামে ডেকেছি। কাঠিখান শুধু চোখ মোটা করে আড়চোখে তাকিয়েছে। গোয়াল থেকে গরু হারিয়েছে, মালিক কোনো কিনারা করতে না পেরে গোয়েন্দা কাঠিখানকে ডেকে এনেছে।

যে কথা সেই কাজ। টিমটিমে একটা টর্চলাইট ছিল। চার্জ দেওয়া হয়নি বলে সেটা এই জ্বলে তো এই জ্বলে না। তা সেখানে আর একটা ছাতা নিয়ে গেলাম গোয়েন্দা কাঠিখানের কাছে। কাঠিখান গুগল থেকে ম্যাপ ডাউনলোড করে বারান্দায় বসে তাই আবার খাতায় আঁকছে। পাশে হারিকেন জ্বলছে। কানে কানে সব কথা বলতেই কাঠিখান হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'তাই আবার হয় নাকি! ওটা তালগাছই। ওখানে ছোটো একটা তালের চারা হয়ত ছিল, তোমরা জানো না। তালগাছ খুব বাড়ে। তার ওপরে দুদিন ধরে বৃষ্টি, জল পেয়ে পেয়ে একেবারে দরদর করে বেড়ে উঠেছে! শার্লক হোমস না পড়লে এসব জানবে কী করে?'

আমার খুব হাসি পেল। শার্লক হোমস প্রায় সব মুখস্থ আমার। কোথাও এমন কিছু নেই। তার ওপরে বাপ-দাদাদের কাছে শুনে আসছি, সব চেয়ে কম বাড়ে তালগাছ। তাই দুদিন বৃষ্টির জল পেয়ে একেবারে দোতলা ছাদের সমান হলো!

কাঠিখান জামার হাতাটাতা গোটাতে গোটাতে বলল, 'কই দেখি! কী ব্যাপার! ভূত না ভূতের পুত চলো তো!' কাঠিখান আমাদের নিয়ে চলতে লাগল। টর্চটা আর জ্বলছে না বলে সেটা নিল না।

আমাদের পুকুরপাড়টা যম অন্ধকার। তারপরে ঝুপঝুপ বৃষ্টি। অন্ধকারে কাঠিখান আগে আগে চলতে লাগল। টাবুকা আমার হাত টিপে ধরে বলল, 'দাঁড়া! আমরা যাব না।'

কাঠিখান মুখে 'দাঁড়া, দেখছি' বলতে বলতে ঝুপঝাপ করে যাচ্ছে। ভেবেছে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে আগান-বাগানে হারিয়ে গেল। আর তার পরেই 'ওরে বাপরে মারে!' চিৎকার এবং পুকুরে ঝপাং করে শব্দ। কাঠিখান পুকুরে পড়ে গেছে! হাউমাউ করে সাঁতরাতে সাঁতরাতে আমাদের কাছে উঠেই কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ওরে বাপরে! দেখি কী আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা তালগাছ হাঁটছে! ওরে বাপরে! বাঁচিয়েছ! ভূত! বাঁচিয়েছ!' বলতে বলতে গরু হারানো বাড়ির দিকে ছুটছে।

আমি তো ভয়ে একেবারে কাদা। টাবুকা পিঠে একখান চড় কষে কাঠিখানের পিছন পিছন ছুটতে বলল। গিয়ে দেখি, বাড়ির মালিককে কাঠিখান বলছে, 'ওরে বাবারে! কী দেখলাম! গরু আর খুঁজে পাব না, তবে তার কপালে কী ঘটেছে বলে দিচ্ছি, গরু ভূতে খেয়েছে!...এই গাঁয়ে আর না, সকাল হলেই চলে যাব, ওরে বাপরে!'

পরেরদিন সকালে বৃষ্টি নেই, কিন্তু মেঘ জমে আছে। কাঠিখান কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টাকা নিয়ে লাপাত্তা। টাবুকা আমাকে টানতে টানতে বাড়ির পিছনে পুকুর পাড়ে আনতেই আমার চক্ষুস্থির। ইয়া লম্বা দুটো পাইপের ওপর পা রেখে উঁচু কাঁঠাল গাছটার মগডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে রবিউল। পাইপ দুটো যেন তার দুই পা, সেগুলো কালো শাড়িতে প্যাঁচানো। আমাদেরকে দেখেই মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। তার পর জিনিসপত্রগুলো তাড়াতাড়ি গোয়ালঘরে রেখে বেরিয়ে এল। আমার বিস্ময়মাখা চোখের দিকে তাকিয়ে টাবুকা বলল, 'এছাড়া আর উপায় ছিল না, গরু কোথায় গেছে তার ঠিক নেই, বাড়ি বাড়ি গোয়েন্দাগিরি!' বুঝতে পারলাম টাবুকার পরামর্শে রবিউলই গাছভূত সেজে কাঠিখানকে ভয় দেখিয়েছে।

এর মধ্যে যার গরু হারিয়ে গেছে, সে এসে বলল, 'কাল রাতে কাঠিখান বুঝি ভূতটাকে খুব মেরেছে!'

আমরা সবাই লোকটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। সে বলে চলল, 'গোয়ালে গরুটা যেভাবে ছিল, ভূতটা সেভাবে আবার রেখে গেছে!'

এ কথা শুনেই আমি আর টাবুকা দুজন দুজনার দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। বৃষ্টি আবার শুরু হলো। ■

গল্পকার

মায়ের প্রতি গাঁয়ের প্রতি

কামাল হোসাইন

জন্ম নিয়ে গাঁয়ে আমার
গাঁয়েই বেড়ে ওঠা
গাঁয়ের ধুলোমাটি মেখে
কেবল ছিল ছোটা।
এই গাঁয়েরই মাটির বুকে
ঘুমায় আমার মা–
সে গাঁর সাথে অন্য গাঁয়ের
হয় কি তুলনা?
মা মানে তো মাটি আবার
মা মানে তো দেশ
দেশটাকে তাই ভালোবেসে
আমরা থাকি বেশ।
মায়ের প্রতি গাঁয়ের প্রতি
চোখ রাঙালে কেউ
সে চোখ দেবে অন্ধ করে
বুকের প্রবল ঢেউ।

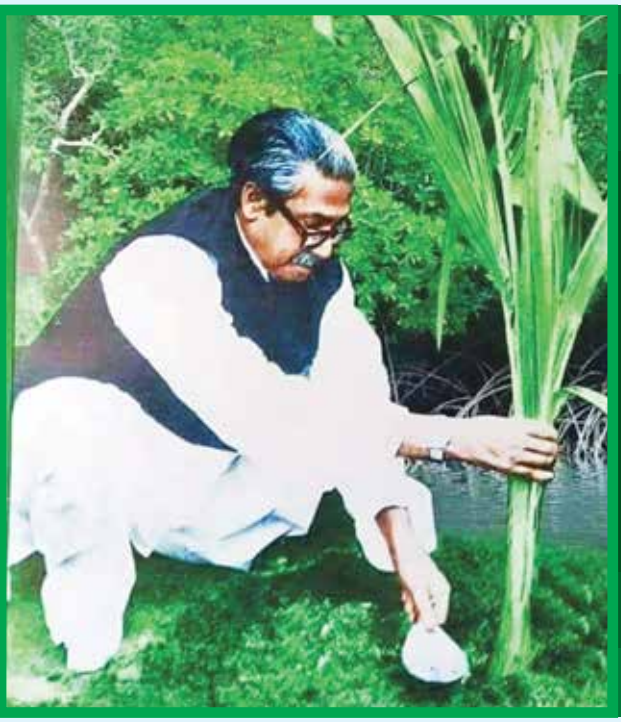

পরিবেশ সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু

মঈনুল হক চৌধুরী

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের সঠিক ব্যবহার ও সংকটাপন্ন পরিস্থিতির কথা সামনে রেখেই প্রতি বছর ৫ই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘে পরিবেশবাদের উন্নয়নে সুইডেনের স্টকহোমে ৫-১৬ই জুন প্রথম পরিবেশ বান্ধব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনকে স্টকহোম সম্মেলন বলা হয়। একই বছর ১৫ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৫ই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করে এবং UNEP (United Nations Environment Programme) নামে পরিবেশবাদী একটি সংস্থা তৈরি করে।

১৯৭৪ সালের ৫ই জুন প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হওয়ার পর থেকে একশটির বেশি দেশে দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। দিবসটি সামুদ্রিক দূষণ, মরুকরণ, ওজোন স্তর, মাটি দূষণ, বিশ্বের উষ্ণতা হ্রাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে গঠিত একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। তাই প্রতিবছর একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দিবসটি পালিত হয়। যা পরিবেশগত সমস্যার প্রতি মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি করে।

মানুষ প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রকৃতির অন্য উপাদানগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকলে মানুষের পক্ষেও সম্ভব না সুস্থ ও সুন্দরভাবে এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা। অথচ আমরা এই সত্যকে উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাপী এগিয়ে চলেছি পরিবেশ বিধ্বংসী

কর্মকাণ্ডে। যে অগ্রযাত্রায় নিয়মিত উজাড় হচ্ছে হাজার হাজার মাইল বনভূমি, পুড়ছে আমাজন, ধুঁকছে প্রাণীর ফুসফুস, গলছে উত্তর-দক্ষিণের বরফ, বাড়ছে সমুদ্রের লোনা পানি, বিষাক্ত হয়ে উঠছে বাতাস।

বঙ্গবন্ধু নদ-নদী, খাল-বিল, প্রকৃতি-পরিবেশকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনিই ১৯৭২ সালে 'যৌথ নদী কমিশন' গঠন করে প্রথম পানি কূটনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। স্বাধীনতা লাভের পরপরই তিনি নদীর নাব্য সংকট দূরীকরণে ড্রেজার সংগ্রহ করেন । তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় বন্ধ করে গাছ লাগিয়ে সুদৃশ্য উদ্যান তৈরি করেন, যার নাম দেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। দূরদর্শী কালজয়ী নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহের উদ্‌বোধনকালেই সুন্দরবন যে উপকূলের সুরক্ষা প্রাচীর তা সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই। স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য। বঙ্গোপসাগরের পাশে যে সুন্দরবনটা রয়েছে, এইটা হলো বেরিয়ার। এটা যদি রক্ষা করা না-হয়, তাহলে একদিন খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ, এ পর্যন্ত পুরো এরিয়া সমুদ্রের মধ্যে চলে যাবে এবং এগুলো হাতিয়া, সন্দ্বীপের মতো আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার যদি সুন্দরবন শেষ হয়ে যায়, তো সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে, সেই ভাঙন থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আর থাকবে না।' বঙ্গবন্ধু সবুজ প্রকৃতির বিষয়ে প্রজ্ঞাবান ছিলেন বলেই ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিরসনে প্রাকৃতিক বনভূমির অবদান নিয়ে এত স্পষ্টভাবে সতর্কবাণী করতে পেরেছিলেন।

সবুজ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু অখণ্ড জমিতে সমবায়ী বহুমুখী খামারভিত্তিক আধুনিক চাষাবাদ, মানসম্মত বীজ উৎপাদন, বিতরণ, সুষ্ঠু সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ফসলের উৎপাদন বাড়াতে প্রতি ইঞ্চি জমিতে সবাইকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে অংশ নিতে আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ১৯৭৩ সালে Bangladesh Wildlife (Preservation) Order 1973 অধ্যাদেশ জারি করেন। দেশের বন্যপ্রাণী বাঁচাতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার তাগিদে ১৯৭৪ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। মূলত এই আইনের মাধ্যমে দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এক নব অধ্যায় সূচিত হয়। সুন্দরবনকে ঝুঁকিমুক্ত রেখে ১৯৭৪ সালে মোংলা ঘষিয়াখালী বাণিজ্যিক নৌপথ চালু করা হয়। সমুদ্রের প্রাণিজ সম্পদের নির্বিচারে আহরণ, ধ্বংস, হ্রাস এবং নীল জলরাশির দূষণ রোধে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র তিন বছরের মধ্যে টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ নামে প্রথম সমুদ্র আইন প্রণয়ন করেন।বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনায় নদীমাতৃক বাংলার জলজ প্রতিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও কৃষির মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁর উন্নয়ন দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সবাইকে একত্রে নিয়ে সমবায়ভিত্তিক গ্রামোন্নয়ন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালে দেশে 'ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম' প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে খুব কম সময় পেলেও তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। এর মধ্যে তাঁর উল্লেযোগ্য অবদান হলো প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ। এরই ফলে তিনি বৃক্ষরোপণে সবাইকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য গণভবন, বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে গাছ লাগান। সারাদেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপরিবহণ অব্যাহত রাখতে পলি অপসারণে বঙ্গবন্ধুর সরকার ড্রেজিং কার্যক্রম জোরদার

করেন। ভারী জাহাজ চলাচলের নৌপথটি সুন্দরবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে– এ আশঙ্কায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে লুপ কাটিং ড্রেজিংয়ের সাহায্যে বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার ঘষিয়াখালী থেকে রামপাল উপজেলার বেতবুনিয়া পর্যন্ত ৬.৫ কি.মি. সংযোগ খাল খনন করা হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাঙালির হাত ধরেই সূচনা হয় উপকূলে বনায়ন কর্মসূচি।

বঙ্গবন্ধু সরকার পরিবেশের পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক পরিবেশ ও এর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় এক সামষ্টিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। । দেশব্যাপী এখন যে বৃক্ষ আন্দোলন, প্রতি বছর জুন মাসে বৃক্ষরোপণের যে উৎসব এবং বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়, তার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন বঙ্গবন্ধুই। তাঁর লেখা 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সালের কারাস্মৃতি থেকে জানা যায় (পাতা-১৬৬) ১৯৬৬ সালের ১৭ই জুলাইয়ের (রোববার) ঘটনায় তিনি লিখেছেন, 'বাদলা ঘাসগুলি আমার দুর্বার বাগানটা নষ্ট করে দিতেছে। কত যে তুলে ফেললাম। তুলেও শেষ করতে পারছি না।' জেলের মধ্যে বন্দি থেকেও তিনি প্রকৃতি-পরিবেশকে ভালোবেসেছেন। প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষায় টান অনুভব করেছেন। ফলে দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক আন্দোলন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ কালের গন্ডি পেরিয়ে তাঁকে দিয়েছে অমরত্বের গৌরব। তাই আমাদের সবারই উচিত হবে এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। ফলে পরিবেশ সচেতন হওয়ার সময় এখনই। যে-কোনো মূল্যে আমাদের জনগণকেই আমাদের পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে কেবল সরকারের পক্ষেই একা পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়। দেশের আপামর জনগণকেও এ বিষয়ে সচেতন হয়ে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে হবে।

তাই আমাদের প্রত্যেককেই যার যার অবস্থান থেকে পরিবেশ সংরক্ষণে নিজ নিজ দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে। তবেই তো আমাদের সবার প্রিয় প্রকৃতি ও পরিবেশ আরো নির্মল ও সুন্দর হয়ে উঠবে। ■

'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা'র উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করেন। ৫ই জুন, ২০২৩

শিশুসাহিত্যিক

গাঁয়ের ছেলে

ইউনুস আহমেদ

আমি গাঁয়ের ছেলে
খোলা মাঠে বেড়াই ঘুরে দু'হাত নেড়ে নেড়ে
সবুজ মাঠের খোলা হাওয়ায় উঠছি আমি বেড়ে।
দূরে দূরে চকের মাঠে ফসলের হাতছানি
ডাকছে আমায় আরও কাছে সেই কথাটি জানি।
আমি গাঁয়ের ছেলে
চাষিদলের সাথে আমি কাটাই সারাবেলা
নাইতে গিয়ে দেখি আমি বক-সারসের মেলা।
গাঁয়ের সরু মেঠো পথে মিষ্টি মধুর হাওয়া
এই জীবনটা আমার কাছে অনেক পরম পাওয়া।
আমি গাঁয়ের ছেলে
রাখাল দলের সাথে করি নিত্য আমি খেলা
গলাগলি সবার সাথেই করি না তো হেলা।
ছোটো-বড়ো সবাই সমান কেউ নয়তো পর
এটাই আমার শেষ ঠিকানা থাকব জীবনভর।
আমি গাঁয়ের ছেলে
নদীপাড়ে বটেরতলায় পঞ্চবটীর মেলায়
নেচে গেয়ে হল্লা করি সময় কাটে খেলায়।
পুব আকাশে সূয্যি মামা যখনই দেয় উঁকি
দিন শুরু হয় ঠিক তখনই মনে আঁকিবুকি।

আমাদের গ্রাম

রকিবুল ইসলাম

আকাশটা ছাদ আর মাটি বিছানা
গ্রামখানি অপরূপ বলি মিছা না।
সকালের সূর্যটা হাসে খিলখিল
নদীতে মাছের রেণু করে কিলবিল।
পালতোলা নৌকারা আসে যায় রোজ
কোন দেশে যায় চলে রাখা দায় খোঁজ।
শিমুলের ছায়াতলে রাখালের বীণ
থেকে থেকে শোনা যায় চৈত্রের দিন।
সবুজের ধানক্ষেত বাতাসের ঢেউ
মুগ্ধতা চোখে-মুখে চেয়ে রয় কেউ।
আম, জাম, কাঁঠালের গাছ সারি সারি
কুটুমের সমাদর প্রতি বাড়ি বাড়ি।

বাংলা কবিতায় গ্রাম

কাজী মহম্মদ আশরাফ

বাংলাদেশ একটি গ্রাম নির্ভর জনবহুল দেশ। এদেশে প্রায় সত্তর হাজার গ্রাম আছে। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর মানে হলো এদেশের গ্রামগুলোতে কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে তাঁতিসহ সকল পেশার লোক বাস করত, এ কারণে এক গ্রামের মানুষকে অন্য গ্রামে খুব বেশি একটা প্রয়োজন ছাড়া যেতে হতো না। সপ্তাহে একদিন নদীর তীরে, বট-পাকুড় বা অশ্বত্থ গাছের নিচে হাট বসলে সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন তাদের পণ্য কেনাবেচা করতে আসত। তবে বেশির ভাগ হাটুরেই গ্রামের ভেতর থেকে আসত।

এদেশের মানুষ শত শত বছর ধরে গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত। এখনও যারা দেশের ছোটো বা বড়ো শহরগুলোতে বাস করে, তারা বছরে এক বা দুই ঈদে বা পূজার ছুটিতে গ্রামে চলে যায়। সেখানে গিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেয়। এখনও অনেকে মারা গেলে তাদেরকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে পারিবারিক অথবা সামাজিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। এসব কারণে ধারণা করা যায়, এদেশের মানুষ এখনও গ্রামীণ জীবন পছন্দ করে। হয়ত চাকরি বা ব্যাবসা অথবা শিক্ষার জন্য শহরে বাস করে, কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে গ্রামে। অন্যদিক থেকে বললে তাদের মনের ভেতর গ্রামগুলো নিঃশব্দে ঘুমিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বড়ো বড়ো মানুষের বেশিরভাগই গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁরা শহরে চলে যান, এবং পরে সেখানেই থিতু হন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন, শেরেবাংলা ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন, এসএম সুলতান, কামরুল হাসান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর টুঙ্গিপাড়া আজও একটি ছায়াঢাকা, পাখি ডাকা শান্ত ও সবুজ গ্রাম। শহুরে জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্যই মানুষ ছুটি পেলে গ্রামে বেড়াতে যায়। এ কারণে গ্রামের দৃশ্য

আঁকা দিয়েই এদেশের শিশুশিল্পীরা চিত্রকলার জগতে প্রবেশ করে। তারা গ্রামের গাছপালা, বাড়িঘর, গরু-মহিষ, নদী ও নৌকা, ধানখেত, কাশবন ইত্যাদি চমৎকারভাবে আঁকতে পারে। গ্রামের আকাশ অনেক বড়ো। সেখানে ফসলের জমি নানা রঙের ফসল বুকে নিয়ে আকাশের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। নদীতে নানা রকমের নৌকা, তীরে গাছপালা, জনপদ ও ফসলের মাঠ। কোথাও নদীর তীরে হাট বসে, কোথাও মেলা হয়। কখনও নদীর কিনারে স্কুল, মসজিদ বা মন্দির চোখে পড়ে। চূড়াগুলো গাছপালার ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে থাকে।

শিল্প ও সাহিত্যের নানা শাখায় গ্রামের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নগরজীবনে কেউ বাঁশি বাজালেও গ্রামের কথা মনে পড়ে যায়, সেখানকার রাখালের ছবি চোখে ভেসে ওঠে। বাংলা কবিতায় এদেশের গ্রামের কথা নানাভাবে উঠে আসে। বাংলার কবিরা গ্রাম নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন, এখনও লিখছেন। বাংলা ভাষায় গ্রামের অনেকগুলো প্রতিশব্দ আছে, যেমন, গাঁ, পল্লি, দেশ ইত্যাদি। অনেক সময় পাড়া শব্দটি দিয়েও গ্রাম বোঝানো হয়। কবিতায় কবিরা সেসব শব্দ নানাভাবে তুলে ধরেন। এখানে প্রথমেই কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'উপহার' কবিতার দিকে দেখি,

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই;
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার মতো বড়ো শহরে বাস করে কবির মন কেমন হু হু করত গ্রামের জন্য, এখানে তিনি সেটাই প্রকাশ করেছেন। দেড়শত বছর পরে আজও একই রকম লাগে এ যুগের কবিদেরও। নাগরিক জীবন যন্ত্রণাদায়ক বলেই মানুষ পল্লিজীবনের প্রতি একটা টান অনুভব করে। অনেক সময় কবি গাঁ, গ্রাম বা পল্লির কথা উল্লেখ না করেও

চমৎকার ভাষায় গ্রামের বর্ণনা লিখে যান। কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'সায়ং-চিন্তা' কবিতায় তেমনই একটা পল্লিদৃশ্য দেখতে পাই,

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গনিচয়;
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ;
নিরুদ্বেগে তরুতলে তটিনীর কলকলে
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন,
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়।

কবি এখানে বলেছেন, গ্রামের শিশুরা নগরের শিশুদের মতো নানা রকম চিন্তায় চিন্তিত হয় না, তারা নদীতীরে গাছের নিচে বসে গান করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করলেও সারাজীবন ধরেই তিনি গ্রাম নিয়ে কবিতা লিখেছেন। গ্রামের মেঘ-বৃষ্টি, ফুল-ফল ও ফসল নিয়ে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। গ্রামের মানুষ, তাদের বাড়িঘর ও হাট-বাজারও তাঁর কলমে কবিতা হয়ে উঠেছে। 'হাট' কবিতায় তিনি গ্রামীণ হাটের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন।

হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে।
জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।
উচ্ছে বেগুন পটল মুলো
বেতের বোনা ধামা কুলো
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা
শীতের র‍্যাপার নক্সাকাটা,
ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে সস্তা ছাতা।

এ কবিতায় গ্রামের একটি হাটের ছবি যেন একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়লে আরও চমৎকার বর্ণনা পাবে। এবার আরেক কবির হাটের চিত্র দেখি। তিনি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তাঁর কবিতার নামও 'হাট'। এ কবির কবিতায় হাটের ছবিটা যেন একটু দূর থেকে আঁকা।

দূরে দূরে গ্রাম দশ বারো খানি,
মাঝে একখানি হাট;
সন্ধ্যায় সেথায় জ্বলে না প্রদীপ
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়,
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পুবের মাঠ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে উঠে দীপ–
আঁধারেতে থাকে হাট।

এখানে হাটের চিরচেনা দৃশ্যের একেবারে বিপরীত ছবিটা তুলে এনেছেন কবি। শিল্পীরা সাধারণত হাটের দিনের ছবি আঁকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেটাই দেখা গেছে। আর যতীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখা যাচ্ছে দূরে দূরে দশ বারোটি গ্রামের মাঝখানে একটি হাট, সেখানে সকালে ঝাড়ু দেওয়া হয় না। হাটখোলায় সাধারণত হাটের নানা রকম উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে, কবি সেটাই বলেছেন। সন্ধ্যাবেলাও সেখানে কেউ প্রদীপ জ্বালায় না। দূরেকার গ্রামগুলোতে যখন আলো জ্বলে ওঠে, তখন হাটখোলাটি একেবারে অন্ধকার হয়ে থাকে। এটাই গ্রামের বাস্তব চিত্র।

রবীন্দ্রনাথ 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় স্বদেশকে মায়ের সাথে তুলনা করে গ্রামের দৃশ্য তুলে ধরে গ্রামকেও মায়ের সমান করে দেখিয়েছেন।

নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল– নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে–
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

পল্লির একটি সাধারণ ছবি গাঁয়ের বউ-ঝিরা কলসি নিয়ে ঘাটে যাচ্ছে, সেটা এখানে তুলে এনেছেন কবি। এখানে রাখালের খেলাঘর, শান্ত দিঘি সবই আছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যের কবিতাগুলোতে হাজার বছরের বাংলার ঐতিহ্য বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনের চিত্র অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বাংলার রূপের বর্ণনার জন্যই গ্রন্থটির নাম রূপসী বাংলা। জীবনানন্দ গ্রামের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন পাড়াগাঁ শব্দটি। তিনি দশ নম্বর কবিতায় লিখেছেন,

আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর
সন্ধ্যায় যে দাঁড়কাক উড়ে যায় তালবনে– মুখে দুটো খড়
নিয়ে যায়– সকালে যে নিমপাখি উড়ে আসে কাতর আবেগে
নীল তেঁতুলের বনে– তেমনি করুণা এক বুকে আছে লেগে
বঁইচির বনে আমি জোনাকির রূপ দেখে হয়েছি কাতর

দেখ, এই কবিতার ভাষা কেমন অদ্ভুত এবং জাদুর মতো! কেমন একটা রূপের জগতে টেনে নিয়ে যায় তোমাকে। কিছুটা চেনা, কিছুটা অচেনা এক জগতের ভেতর অদ্ভুত একটা রূপ ও রঙের ভেতর দিয়ে নিয়ে যায়। উনচল্লিশ নম্বর কবিতায় এমনই আরেকটা দৃশ্য দেখতে পাই:

কুয়াশারে নিঙরায়ে উড়ে যাবে আরো দূর নীল কুয়াশায়
কেউ তাহা দেখিবে না– সেদিন এ পাড়াগাঁর পথের বিস্ময়
দেখিতে পাবো না আর– ঘুমায়ে রহিবে সব;

এখানেও একটা জাদুর মতো বিস্ময়ের ঘোর আছে। কাজী নজরুল ইসলামও গ্রামকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি 'পল্লী-জননী' কবিতায় পল্লিবাংলাকে এভাবেই উল্লেখ করেছেন,

এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবণী॥
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি॥

এখানে বৈশাখের গরম আবহাওয়ার মধ্যে, জ্যৈষ্ঠের আরও তীব্র তাপদাহের মধ্যেও যে বাংলার গ্রামগুলো এক বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশিত হয়, কবি সেটি প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্যভাষায়। নজরুলের আরেকটি কবিতার নাম 'রাখাল রাজা', সেখানে তিনি গ্রামের একজন রাখালের রূপ ধরে বাস করতে চান। বিহারীলাল চক্রবর্তী যেমন তাঁর কবিতায় নগরজীবন ছেড়ে গ্রামে গিয়ে কৃষকের সাথে মিশে থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, এখানে নজরুল চেয়েছেন রাখাল ছেলে হয়ে মাঠে গরু চরাবেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই কবিতার অংশটি পড়:

–আমি হব গাঁয়ের রাখাল ছেলে।
বল্‌ব,'দাদা, প্রণাম তোমায়, ঘুম ভাঙিয়ে গেলে!"
আঁচল ভ'রে মুড়ি নেব হাতে নেব বেণু,
নদীর পাড়ে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
বাছুরটিরে কোলে ক'রে পার হব ভাই খাল,
বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল ছেলের পাল।

কবি এখানে নগরজীবন ছেড়ে গ্রামে গিয়ে সত্যিকারের যেন রাখাল হয়ে উঠছেন কবিতাটিতে সেরকমই চিত্র

ভেসে ওঠে। গ্রামীণজীবনে যেমন অনেক আনন্দ আছে, অবারিত মাঠে খেলার সুযোগ আসে, তেমনি সেখানে গভীর বেদনার ঘটনাও ঘটে। সেখানে সুচিকিৎসার অভাবে শিশুদের মৃত্যুর হার বেশি। সেখানকার শিশুরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে মায়েদের কেমন লাগে, তেমনই একটি অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর 'পল্লী-জননী' কবিতায়। গভীর আবেগের সেই কবিতাটি পড়তে পড়তে তোমার চোখে পানি এসে যাবে। এখানে কিছুটা অংশ তুলে ধরা যায়:

রাত থমথম স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর– ঘোর–আন্ধার,
নিঃশ্বাস ফেলি তাও শোনা যায়, নাই কোথা সাড়া কার।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিয়ে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম ঘুম চোখে ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।

পল্লিগ্রামের ছেলেদের অনুভূতির কথাই এতক্ষণ জানতে পারলে, সেখানকার মেয়েদের মনের আনন্দ কেমন? তা জানা যায় সুফিয়া কামালের 'পুরানো দিনের স্মৃতি' কবিতায়। এখানে নগরজীবনে অভ্যস্ত কবি তাঁর কৈশোর স্মৃতিতে অবগাহন করে কবিতাটি রচনা করেছেন। তবে জেনে রাখা ভালো, এ স্মৃতি শুধু গ্রামের মেয়েদেরই নয়, সেখানকার ছেলেরাও এ ধরনের ঘটনায় জড়িত থাকে, তাদেরও ম্লান মধুর স্মৃতি থাকে।

বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লী-মায়ের কোল,
ঝাউশাখে যেথা বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল!
কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া কাঁচা পাকা কুল খেয়ে,
অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছি গাঁয়ের দুলালী মেয়ে।
পৌষ-পার্বণে পিঠা খেতে বসে, খুশীতে বিষম খেয়ে,
আরো উল্লাস বাড়িয়াছে যেন মায়ের বকুনি পেয়ে।

গ্রামকে মায়ের সাথে সরাসরি তুলনা করেছেন বাংলাদেশের আরেকজন পল্লিকবি বন্দে আলী মিয়া। তিনি গ্রামের বাস্তবতার চেয়ে সৌন্দর্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কবিতায়। লিখেছেন,

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘী
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকি মিকি।
আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।

কবি এখানে জানিয়েছেন গ্রামের গাছপালাগুলো আত্মীয়-স্বজনের মতো মিলে মিশে থাকে। কী চমৎকার উপস্থাপনা, তাই না? ■

সাংবাদিক ও প্রভাষক

আমাদের গ্রাম

সাবিত্রী রানী

মন ছুটে যায় স্মৃতির টানে
কোন সে সুদূর পানে?
হৃদয় দর্পণে ভাসে কোন মুখখানি?
ছোটো সে গাঁয়ের নির্মল ছবিখানি।
যেখানে আছে সবুজের মাঠ
আর আঁকাবাঁকা মেঠো পথ
জলভরা দিঘি, শানবাঁধানো ঘাট।
আম-জাম-কাঁঠালের বনের ধারে
রাখাল গরু চরায় সারা দিনমান
সন্ধ্যে হলে গরু লয়ে বাড়ি ফিরে
মাঠে মাঠে সুমধুর রাখালি গান।
মায়াময় কত রূপের বাহার!
তুমি সকল দেশের সেরা।
তোমার কোলে জন্ম নিয়ে
আমরা সুখে হই আত্মহারা।

গ্রামকথন

মো. মোনায়েম আহমেদ

গ্রামবাংলার রূপ সৌন্দর্য
ভরে উঠে লাবণ্য সজীবতায়
যেদিকে চোখ যায়
হৃদয় আমাদের ভরে যায়।

আঁকাবাঁকা মেঠো পথ
মুগ্ধ করে গভীরভাবে
এমন সুন্দর গ্রামের দৃশ্য
আর কোথাও না খুঁজে পাবো।

ফুল ফসলে ভরা
গ্রামের মাটি-বায়ু-জল
এসব দেখে হয়ে উঠে
মন উতলা চঞ্চল।

পরিবেশ

আলমগীর কবির

গাছপালা নদীনালা
কী মায়াবী পরিবেশ!
রূপে গুণে অনন্যা
আমাদের প্রিয় দেশ।
মাঠে মাঠে সোনা ধান
গ্রামগুলো রূপবতী,
সারাদিন খেলা করে
ফুল পাখি প্রজাপতি!
ভালোবাসা মমতায়
এসো আজ গড়ি দেশ,
সবুজেতে ভরে তুলি
আমাদের পরিবেশ।

আমার প্রিয় গ্রাম

মনির জামান

নানান রকম গাছগাছালি
ছবির মতো রাখা
মাঠের শেষে বয়ে গেছে
নদী আঁকাবাঁকা।

মাছে ভরা বারো মাস
করতোয়া নাম
সেই নদীটির পাশেই জাগে
আমার প্রিয় গ্রাম।

চোখ মেললেই ভেসে ওঠে
ফুল-ফসলের হাসি
নিবিড় ছায়ায় ফড়িং নাচে
দোয়েল বাজায় বাঁশি।

ছোটো-বড়ো কত মানুষ
কত তার রীতি
দুঃখ শোকে একই রক্তে
খেলছে অযুত স্মৃতি।
রাত্রি এলে জ্যোৎস্নালোকে
চন্দ্র তারায় ঘেরা
ধৈর্য দানে মাতৃসমা
সবার চেয়ে সেরা।

বাবার আদর

আরিফুল ইসলাম মুকুল

আদর আর ভালোবাসার পরশে
বাবা আছো হৃদয়ের গহীনে
জড়িয়ে রেখেছ আমায়
তোমার স্নেহের বাঁধনে।

গুরুজনদের সম্মান করা
সাথে দাও সামাজিকতা শিক্ষা
নিয়ম-নীতি মেনে তুমি
উত্তম চরিত্র গঠনে দাও দীক্ষা।

লেখাপড়া, খেলাধুলায় সব কাজে
বাবা তুমি উৎসাহ যোগাও
কোনো বিপদ আসলে পরে
বন্ধু বেশে হাতটা বাড়াও।

তোমার আদর্শে জীবনকে
রাখি ভালোবাসার বাহুডোরে
বাবা তুমি মিশে আছো
হৃদয়ের গভীর হতে গভীরে।

বাবা আমার

মো: জাওয়াদ আলম

আনন্দে নেচে ওঠে বলে
আমার এই মন
বাবা আমার অনেক প্রিয়
আমার আপনজন।

পড়ালেখা করে আমি যেন
একজন ভালো মানুষ হই
তাই তো তিনি নিয়ে আসেন
আমার জন্য মনীষীদের বই।

দুষ্টুমিতে থাকলে মেতে
ডেকে নিয়ে করেন আমায় আদর
মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে
দুষ্টুমি না করতে করেন বারণ।

৮ম শ্রেণি, হায়দার আলী স্কুল, মাডা, ঢাকা

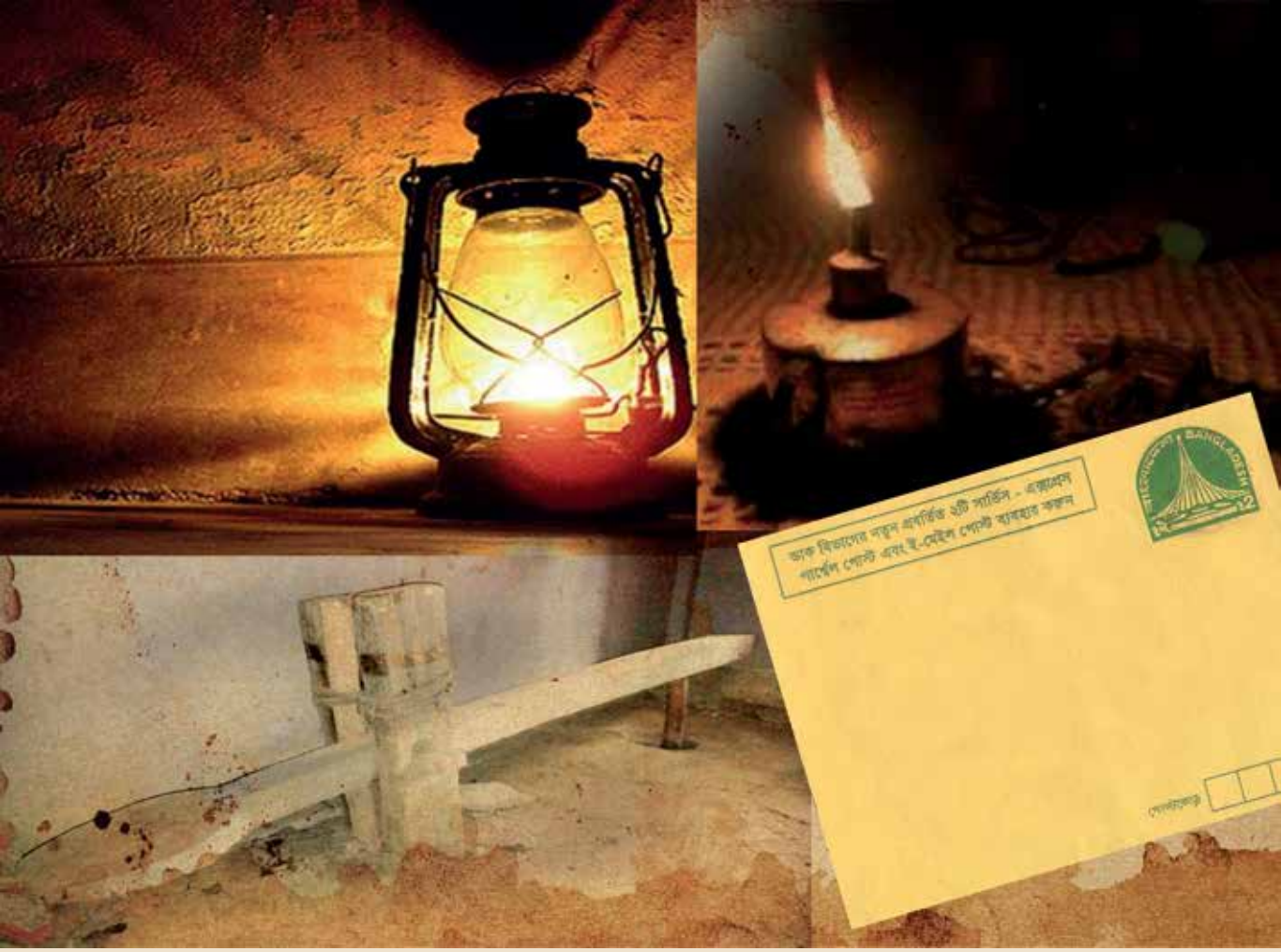

হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ অনুষঙ্গ

সুমন প্রামাণিক

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে জীবন ধারণে এসেছে নতুন গতি। এরই সাথে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেক জিনিসপত্রও। বিশ বা ত্রিশ বছর আগে যে জিনিসগুলো অতীব প্রয়োজনীয় ছিল, বর্তমান সময়ে সেগুলো মুছে গেছে আমাদের জীবনপ্রবাহ থেকে, এমনকি অনেক জিনিসপত্রের নামও মুছে গেছে স্মৃতি থেকে। তেমনি হারিয়ে যাওয়া গ্রামের কিছু অনুষঙ্গের কথা জানাবো তোমাদের–

চিঠি

একটা সময় মানুষের সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি। কাছের মানুষের কাছ থেকে একটা চিঠি পেতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত সবাই। চিঠিই ছিল ভাবনা ও যোগাযোগের পারস্পরিক সেতুবন্ধন। ডাকপিয়ন সাইকেলের ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি এসে দিয়ে যেতেন খাম, পোস্টকার্ড। এখন এসব শুধুই স্মৃতি। এই চিঠি নিয়ে হয়েছে কত গান, কবিতা, উপন্যাস ও সিনেমা। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে চিঠি হারিয়ে গেছে সমকালীন জীবনব্যবস্থা থেকে।

কুপি

গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে কুপি বাতি জ্বলত। রাতের বেলায় আলোর জন্য কুপি ছিল একমাত্র অবলম্বন।

প্রতিটি ঘরেই পাওয়া যেত এটি। সেকালের রাজপ্রাসাদেও জ্বলত বাহারি রকমের কুপি বাতি। মাটি, বাঁশ, লোহা, কাচ বা পিতল দিয়ে তৈরি করা হতো এই কুপি। বিভিন্ন নকশা ও নানা ধরনের কুপি পাওয়া যেত। কুপির আলো ছড়িয়ে দিতে ব্যবহার হতো কাঠের স্ট্যান্ড। পুরনো গেঞ্জি অথবা সুতি কাপড় ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়ে ঢোকানো হতো কুপি বাতিতে। এতে জ্বালানি হিসেবে কেরোসিন তেল ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আধুনিক সভ্যতায় হারিকেন ও কুপি বাতির স্থান দখল করে নিয়েছে বিদ্যুৎ, সোলার প্লান্ট ও চার্জার লাইট।

হারিকেন

সূর্য ডুবতেই বাড়িতে বাড়িতে জ্বলে উঠত হারিকেন। একটা গ্রামকে দূর থেকে দেখলে মনে হতো মাটির বুকে জ্বলছে আকাশের তারা। গ্রামে রাতের ঘর আলো করতে ভরসা ছিল হারিকেন। হারিকেন জ্বালাতে লাগত কেরোসিন। এটি জ্বালিয়ে গ্রামাঞ্চলে রাতে বিয়েশাদি, যাত্রাগান, মঞ্চনাটক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হতো। হারিকেন জ্বালিয়ে সবাই একসঙ্গে পড়াশোনা করত। ব্যবহারের পর রশি দিয়ে বেঁধে রান্নাঘরের কোনো স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হতো। সন্ধ্যার আগেই হারিকেনের কাচ মুছে তেল ভরে জ্বালানো হতো। গ্রামে রিকশার নিচে আলোর জন্য ব্যবহৃত হতো এই হারিকেন। প্রযুক্তি ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঐতিহ্যবাহী হারিকেন এখন বিলুপ্তির পথে।

ঢেঁকি

গ্রামীণ জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল ঢেঁকি। চাল গুঁড়া করার একমাত্র মাধ্যম ছিল এটি। প্রতিটি বাড়িতেই ছিল ঢেঁকি। যেখানে বসতি; সেখানেই ঢেঁকি। উৎসব-পার্বণে ধান থেকে আতপ চাল তৈরি করতে, পিঠা বানাতে, চালের গুঁড়া তৈরি করতে ঢেঁকির ধুপধাপ শব্দ শোনা যেত। গ্রামীণ বউ-ঝিরা একসঙ্গে ঢেঁকিতে বারা ভানত আর গান গাইত। এতে ২-৩ জন নারী কাজ করতেন। ১-২ জন মুষল উত্তোলনের জন্য ধড়ের এক প্রান্তে পা দিয়ে পালাক্রমে চাপ দিত। পা সরিয়ে নিয়ে মুষলকে নিচে পড়তে দেন। অন্য একজন খোঁড়ল থেকে ধান বা চাল সরিয়ে নিতেন। তাতে নতুন করে আবার ধান বা চাল দিতেন।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে গেছে ঢেঁকি। সবাই এখন রাইস মিলে ধান বা চাল ভানছে। এখনকার অনেক ছেলেমেয়েরা জানে না ঢেঁকির নাম। গ্রামের দুই-একটি বাড়িতে এখনো ঢেঁকি দেখা গেলেও সেটি পড়ে আছে অযত্নে-অবহেলায়। ঢেঁকির দেখা মেলে এখন সিনেমা-নাটকে, জাদুঘরে কিংবা কোনো প্রদর্শনীতে।

রেডিও

টেলিভিশনের আগে রেডিও ছিল সংবাদ এবং বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন সকল সংবাদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিত রেডিও। গ্রামের দোকানগুলোতে চলত রেডিও। গ্রামের মানুষ সকালে বা বিকেলে দলবেধে বসে খেলার ধারা বিবরণী কিংবা খবর শুনত। ছোটো-বড়ো নানা সাইজের রেডিও বাজারে পাওয়া যেত। কৃষকেরা মাঠে-ঘাটে কাজের সময় রেডিওতে গান শুনত। টেলিভিশনের বিস্তার লাভে রেডিও হারিয়ে গেছে কালের বিবর্তনে।

ক্যাসেট

গান শোনার ঐতিহ্য বাঙালির অনেক দিনের। একটি ক্যাসেটের ভেতর লম্বা সরু সেলুলয়েডের ফিতা থাকত। এ ক্যাসেট দিয়ে গান রেকর্ড এবং গান বাজানো সবই করা যেত। সত্তরের দশকে ক্যাসেটের আবির্ভাব ঘটে সংগীতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে। আশির দশকে রাজত্ব করেছে ক্যাসেট। গ্রাম কিংবা শহর সবখানেই ছিল ক্যাসেটের জয়জয়কার। সিনেমার গান, পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি এছাড়াও ওপার বাংলার জনপ্রিয় গান বেজে উঠত বাড়িতে বাড়িতে ক্যাসেটের ভেতর।

লাঙল

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ভোরের আলো ফুটতেই গ্রামের চাষিরা কাঠের তৈরি লাঙল হাতে ছুটে যেত মাঠে। জমি চাষের ঐতিহ্যবাহী এক পদ্ধতি ছিল লাঙলের ব্যবহার। গরু বা মহিষের সাহায্যে লাঙল ব্যবহার করা হতো। এটি ছিল অনেক উপযোগী এক

পদ্ধতি। কারণ লাঙলের ফলা জমির অনেক গভীর পর্যন্ত আলগা করত। গরুর পায়ের কারণে জমিতে কাদা হতো অনেক। আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার এই ঐতিহ্যটি। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কৃষকদের জীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের ছোঁয়াও লেগেছে কৃষিতে।

পালকি

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এক প্রাচীন বাহন পালকি। মানুষ বহন করার কাজেই এ পালকি ব্যবহার করা হতো। বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিয়েতে বর-কনের জন্য পালকি ব্যবহারের প্রথা চালু ছিল। এছাড়াও ধনী বা উঁচু বংশের লোকেরা এতে চড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতেন। পালকিকে কয়েকজন কাঁধে ঝুলিয়ে সামনের দিকে চলত। যারা কাঁধে করে বহন করে থাকেন তাদের পালকির বেহারা বলে। পালকির ভেতরে ১ জন বা ২ জন থাকত, আর পালকির বেহারা হিসেবে থাকত ২ থেকে ৮ জন। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য পালকি এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে। ■

সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক নাগরিক সংবাদ ও দি ভয়েস অব এশিয়া

কৈখালী গ্রামের কিশোরীরা

জান্নাতে রোজী

সাতক্ষীরার কৈখালী ইউনিয়নে যেদিকে চোখ যায় শুধুই লোনা পানি। পিরিয়ড চলাকালে এখানকার গ্রামের মেয়েদের এই লোনা-নোংরা পানি ব্যবহার করতে হয়। লোনা পানি ব্যবহার করলে বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হয় নারীরা। তাই এই ঝামেলা এড়াতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল খেয়ে পিরিয়ড বন্ধ রাখছিল স্থানীয় কিশোরীরা। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও কৈখালীতে এতদিন এমনটাই চলছিল।

কৈখালীর অসহায় কিশোরীদের এমন পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্র্যান্ড 'সেনোরা'। তাদের উদ্যোগেই শুরু হয়েছে 'মেয়ে, তোমার স্বস্তির জন্য' ক্যাম্পেইন।

কৈখালীতে বৃষ্টি হয় প্রচুর, তাই এই ক্যাম্পেইনে সেনোরা উদ্যোগ নেয় বৃষ্টির পানি সংগ্রহের। ইউনিয়নের ৬টি পয়েন্টে বসানো হয় ১২টি পানির ট্যাংক, যেন মেয়েরা পিরিয়ডসহ অন্যান্য প্রয়োজনে এই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারে। তাদের উদ্যোগে কৈখালী ইউনিয়নে কিশোরীদের নিয়ে কয়েকটি উঠান বৈঠকের আয়োজন করে, দেওয়া হয় ৩ মাসের ফ্রি স্যানিটারি ন্যাপকিন। যে-কোনো প্রয়োজনে তারা যোগাযোগ করতে পারবে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের কল সেন্টারে (০৮০০০৮৮৮০০- টোল ফ্রি) সে সুবিধাও দেওয়া হয় কিশোরীদের।

এছাড়া তারা কৈখালী গ্রামে কিছু মেয়েকে প্রশিক্ষিত করেছে, যারা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রয়োজনে কিশোরীদের পাশে থাকছে। গ্রামজুড়ে তারা পরিচিত হচ্ছে 'নোরা আপা' নামে। নোরা আপাদের মাধ্যমে কিশোরীরা পাচ্ছে তাদের শারীরিক সমস্যায় নানাবিধ পরামর্শ ও সহায়তা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কিশোরীরা যদি দিনের পর দিন পিল খেয়ে পিরিয়ড বন্ধ রাখে তাহলে তাদের আর নিয়মিত পিরিয়ডই হবে না। এতে করে তাদের নানা শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি বন্ধ্যাত্ব পর্যন্ত হতে পারে।

সবারই চাওয়া কৈখালীর মেয়েরা থাকুক স্বস্তিতে আর বাংলার সবখানে এই স্বস্তির গল্প ছড়িয়ে পড়ুক। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. বিশ্বের বৃহত্তম গ্রাম, ৪. যে কাঠ কাটে, ৭. বাংলাদেশের একটি জেলা, ৮. দঃখ, ৯. লবের বিপরীত শব্দ, ১১. মনোযোগ

উপর-নিচ: ২.ঘুম, ৩. বুদ্ধিমান, ৪. বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ খেলা, ৫. বুদ্ধিজীবী আবুল ফজলের লেখা আত্মজৈবনিক গ্রন্থ, ৬. হুবহু, ৭. হজমের একটি অসুখ, ১০. কাজ সম্পাদনের অনুকূল অবস্থা, ১২. লবণাক্ত

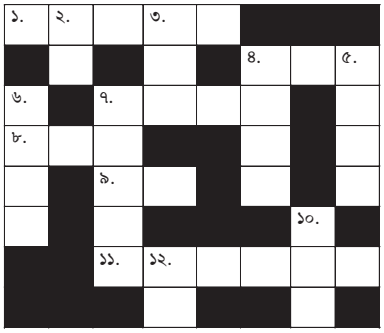

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: পরিবেশবান্ধব
হাসপাতাল, সুপথ
বেনারসি, গরমকাল
মা, বাল্যকাল
গোবর, মেষপালক

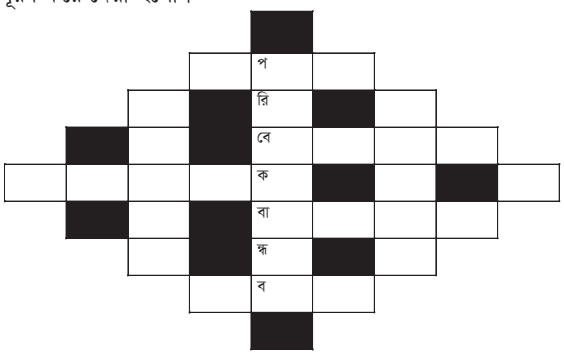

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপর-নিচ আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

		৭৫	৫০				৪৬	
৭৮				৪০			৪৩	৪৪
৮১			৫২		১০			১৩
		৭২					৩	
৬৯	৬৮		৫৪			১		
		৫৬		৩৬	৭		৫	
৬৫			৩৪		২৮		২২	
	৬৩			৩০		২৪		
৬১		৫৯		৩১		২৫		১৯

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৭	*		-	৩	=	
+		*		+		*
	/	২	-		=	১
-		+		*		+
২	+		/	২	=	
=		=		=		=
	-	৬	+		=	৮

মে মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

জু	লি	ও	কু	রি	প	দ	ক
	ও		য়া			ম	
ডা	না		কা			ক	ম
	দৌ		টা	ক	শা	ল	
	দ্য			র			বি
	ভি			তো	ড়	জো	ড়
	ঞ্চি		টি	য়া			বি
		বা	ন		শি	ক	ড়

ছক মিলাও

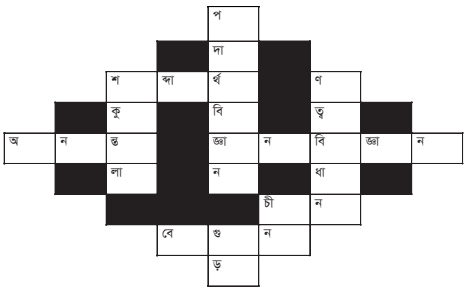

নাম্ব্রিক্স

৬৯	৬৮	৬৭	৫৮	৫৭	৫৬	৫	৬	৭
৭০	৮১	৬৬	৫৯	৬০	৫৫	৪	৩	৮
৭১	৮০	৬৫	৬৪	৬১	৫৪	১	২	৯
৭২	৭৯	৭৮	৬৩	৬২	৫৩	১৬	১৫	১০
৭৩	৭৬	৭৭	৫০	৫১	৫২	১৭	১৪	১১
৭৪	৭৫	৪৮	৪৯	৩৪	৩৩	১৮	১৩	১২
৪৩	৪৪	৪৭	৩৬	৩৫	৩২	১৯	২০	২১
৪২	৪৫	৪৬	৩৭	৩০	৩১	২৬	২৫	২২
৪১	৪০	৩৯	৩৮	২৯	২৮	২৭	২৪	২৩

ব্রেইন ইকুয়েশন

২	*	২	+	১	=	৫
+		*		*		+
৬	*	৩	-	৯	=	৯
-		-		-		-
৩	+	৩	+	১	=	৭
=		=		=		=
৫	*	৩	-	৮	=	৭

ছোটোদের আঁকা

ইরাম ইনায়া, চতুর্থ শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আহনাফ রহমান আরিয়ান, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

রেদোয়ান মোস্তফা, দ্বিতীয় শ্রেণি, ইংলিশ মিডিয়াম, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নাজিবা নাওয়াল, সপ্তম শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গ্রীণ রোড, ঢাকা

মুহসিনা রহমান, অষ্টম শ্রেণি, বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

ত্বকী তাহমিদ রিহিন, পঞ্চম শ্রেণি, উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-12, June 2023, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

মুজতানিবা মোজাহিদ, চতুর্থ শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা